সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

নভেম্বর-ডিসেম্বর যুগ্ম সংখ্যা ২০১৬

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শত তরুণের সাক্ষাৎ

০১. ১১ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকায় বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদকে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা

০২. ৩১ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনে শুভ দীপাবলী উদ্‌যাপনরত হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

০৩. ৫ নভেম্বর ২০১৬ থেকে ভারত-বাংলদেশ যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণ মহড়া 'সম্প্রীতি ২০১৬' ঢাকার টাঙ্গাইলে শুরু হয়। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সহযোগিতা প্রচেষ্টা হিসেবে এই মহড়া হচ্ছে ৬ষ্ঠ সংস্করণ, যা উভয়দেশে পালাক্রমে অনুষ্ঠিত হবে। সম্প্রীতি ২০১৬ যৌথ মহড়া একটা ছদ্ম দৃশ্যপট তৈরি করে যা জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী উভয় দেশ প্রতিবিপ্লব ও সন্ত্রাসবিরোধী পরিবেশে একযোগে কাজ করছে

০৪. ২ নভেম্বর ২০১৬ ভারতীয় উপকূলীয় রক্ষী বাহিনির বাংলাদেশের ১৬ জন জেলেসহ উদ্ধারকৃত ট্রলার 'তামান্না'কে ১৪ নভেম্বর ২০১৬ বাংলাদেশ নৌবাহিনির কাছে হস্তান্তর করা হয়

০৫. ২৮ নভেম্বর ২০১৬ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের এমপিকে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন

০৬. ১৩-১৪ নভেম্বর ২০১৬ ভারতীয় হাই কমিশনারের রংপুর সফরকালে বিএসএফ-এর সংবর্ধনা

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

Website: **www.hcidhaka.gov.in**
/IndiaInBangladesh; @ihcdhaka; /HCIDhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

বর্ষ চুয়াল্লিশ | যুগ্ম সংখ্যা ১০-১১ | কার্তিক-পৌষ ১৪২৩ | নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৬

কাশ্মীর: পর্বতের ভাঁজের ওপারে উন্মুক্ত উপত্যকা পৃষ্ঠা: ৪৫

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ	আঞ্চলিক সমীকরণে ব্রিকস্ এন্ড বিমস্টেক আউটরিচ শীর্ষ সম্মেলন: নিরাপত্তা ও উন্নয়ন ইন্টারফেস ০৪
ব্যক্তিত্ব	সুষমা স্বরাজ ০৭
মুক্তিযুদ্ধ	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৮
প্রচ্ছদ রচনা	রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শত তরুণের সাক্ষাৎ ১০
সৌহার্দ	বাংলাদেশের তাল পড়ে ভারতে ॥ আশিস সৈকত ১৩ রোমাঞ্চকর এক ভারত সফরের অভিজ্ঞতা রাশেদ মেহেদী ১৫
ছোটগল্প	একটি কল্পকাহিনি ॥ ঋতা বসু ১৭
নিবন্ধ	সলিল চৌধুরী ও আমাদের প্রজন্ম ॥ পরাগবরণ পাল ৩৮
বিজ্ঞান	স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ২১
কবিতা	সন্তোষ ঢালী ॥ জগন্ময় মজুমদার তাপস রায় ॥ অনিন্দিতা বসু সান্যাল ২৪ শামসুল আলম ॥ দুখু বাঙাল নীহার মোশারফ ২৫
উদ্‌যাপন	প্রবাসী ভারতীয় দিবস ২০১৭ ২৬
রাজ্য পরিচিতি	মেঘালয় ২৭
ধারাবাহিক	পাসিং শো ॥ অমর মিত্র ৩৪
ভ্রমণ	কাশ্মীর: পর্বতের ভাঁজের ওপারে উন্মুক্ত উপত্যকা জাকারিয়া পলাশ ৪৫
অনুবাদ গল্প	সূর্পণখা ॥ অমিত চৌধুরী ৪১
শেষ পাতা	সংগীতের ভাষা সর্বজনীন ॥ আইয়ুব বাচ্চু ৪৮

১০ থেকে ১২

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শত তরুণের সাক্ষাৎ

রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের দরবার হলে আগমনের পরপরই সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশী হলাম– ভারতবর্ষের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে কিছুটা অনন্য সময় অতিবাহন। আমাদের উদ্দেশে বক্তৃতায় তিনি যেমন স্বাগত করলেন আমাদের তেমনি দেশভাগের দুঃখের কথাও বললেন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা, বঙ্গবন্ধুর কথা তো বললেনই; একইসঙ্গে বললেন বাংলা নাটকের চরিত্রচিত্রণে পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্যের উদ্ভাসনের কথা। বিশেষ করে বললেন ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা'র প্রসঙ্গ। মানচিত্র বিভক্তি যে কখনো বন্ধুত্বের বিভক্তিরেখা টানতে পারে না তা-ও বললেন গুরুত্ব সহকারেই। আপ্লুত হয়ে রইলাম তাঁর অনন্যসাধারণ, হৃদয়স্পর্শী বক্তব্যে।

সম্পাদক **নান্টু রায়**
ফোন ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: editor.bb@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মো. জিলানী চৌধুরী

মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন ৯৫৬২১৯৮

প্রকাশক ও মুদ্রাকর **ভারতীয় হাই কমিশন**
বাড়ি ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

নিরন্তর সমৃদ্ধ হই

বাংলাদেশ ও ভারতের সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ-স্মারক হল *ভারত বিচিত্রা*। পত্রিকাটি সুসম্পাদিত। এর আঙ্গিক সৌষ্ঠব ও রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য পাঠককে টানে– আকৃষ্ট করে। পত্রিকাটি পাঠ করে আমরা পাঠকেরা নিরন্তর সমৃদ্ধ হই। *ভারত বিচিত্রা*র গত মে এবং সেপ্টেম্বর ২০১৬ সংখ্যা দুটিতে আমার দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। *ভারত বিচিত্রা*র আরো সমৃদ্ধি ও প্রচার কামনা করি।

সরওয়ার মুর্শেদ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

খোলা চিঠি

পরিবেশ সুরক্ষা ও ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানবজাতির জন্য ফল বিধাতার এক অকৃত্রিম দান, যা মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য অতি প্রয়োজনীয়। বৃক্ষের সঙ্গে প্রাণী ও জীব জগতের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের অশেষ ভূমিকা। দুর্গম পাহাড়, পর্বত, সমুদ্রের ভয়াবহ তরঙ্গমালা পেরিয়ে সবুজের সমারোহ এনে পৃথিবীকে টিকিয়ে রেখেছে এই বৃক্ষ। কিন্তু মানুষ আজ পরিবেশ ও অস্তিত্বের কথা ভুলে বনজ সম্পদ ধ্বংসের হোলিখেলায় মেতে উঠেছে– যার কারণে দেশ আজ মরুকরণের দ্বারপ্রান্তে; যার জন্য বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইড বৃদ্ধি পেয়ে বায়ুমণ্ডলে বাড়ছে উষ্ণতা; যার কারণে পরিবেশ তার ভারসাম্য হারিয়ে দেশে শুরু হয়েছে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, অকাল বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত ভয়াবহ দুর্যোগ। আগেই বলেছি, ফল বিধাতার এক অনন্য দান– যা বহুমাত্রিক মানে-স্বাদে-পুষ্টিতে ও ভেষজ গুণে পরিপূর্ণ। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে চাহিদার তুলনায় ফলের গড় প্রাপ্যতা মাত্র ৩৫ গ্রাম, যা অত্যন্ত অপ্রতুল। এর মূল কারণ আমাদের দেশে ফলের উৎপাদন মৌসুমভিত্তিক, অধিকাংশ ফল মধুমাস অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন, বাকি ৪৬ভাগ ফল উৎপাদন হয় আট মাসে। এছাড়া জনসচেতনতার অভাবে বাংলাদেশর প্রায় ২কোটি বসতবাড়ির আঙ্গিনা অনাদর-অবহেলায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, মৌসুমী ফলগুলো সহজেই পচনশীল। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রতিদিন গড় উৎপাদনের ১৫/২০ভাগ ফল পচে নষ্ট হচ্ছে। আবার কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা লাভের আশায় অপরিপক্ক ফল ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে বাজারজাত করছে। এতে ক্রেতারা বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং ফলের পুষ্টিগুণ হারাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এতে মানবদেহের পা থেকে মাথা পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এমনকি মরণব্যাধি ক্যান্সারও হতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যপূরণের পথে অশিক্ষাই প্রধান অন্তরায়। আধুনিক বিশ্বে উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমানাধিকারে সরকার বদ্ধপরিকর। শিক্ষা জাতির উন্নয়নের চাবিকাঠি। মানসম্মত আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে দেশকে দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত এবং উন্নত করা সম্ভব। এজন্য তরুণ প্রজন্মকে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিগত দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হয়ে নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন, সৎ, দেশপ্রেমিক, মননশীল, যুক্তিবাদী, নীতিবান, সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন হয়ে উঠতে হবে এবং নিজ-নিজ কর্মক্ষেত্রে সফল নেতৃত্বদান করতে হবে।

কুঠিপাড়া পল্লী উন্নয়ন যুব সংঘ এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। দেশের মানুষকে সচেতন করতে এ খোলা চিঠির অবতারণা। আশা করি *ভারত বিচিত্রা* কর্তৃপক্ষ চিঠিটি ছাপিয়ে বাধিত করবেন।

মুন্সি আফজালুর রহমান সভাপতি
কুঠিপাড়া পল্লী উন্নয়ন যুব সংঘ
হরিপুর, চাটমোহর, পাবনা

পরিপূর্ণ মানুষ

হিমালয় পর্বতমালার আঁচলের নীচে অবস্থিত বাংলাদেশের উত্তরের জেলা নীলফামারী। হিমালয়ের পরশে লালিত-পালিত ছোট জেলা শহরটি কালের প্রবাহে শিক্ষা, সংস্কৃতি, নাটক, খেলাধূলা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, তথ্য প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ। স্কুল-কলেজ বেড়েছে। বেড়েছে শিক্ষার ও পাশের হার। দূরত্ব কমেছে গ্রাম ও শহরের কিন্তু শক্তি ঔষধালয়ে পাঠকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে প্রতিদিন। *দৈনিক সংবাদ, একতা, কালের কণ্ঠ, মানবকণ্ঠ, সমকাল, দৈনিক নীলকথা, সাপ্তাহিক নীলফামারী বার্তা* পাঠকের জন্য মজুদ থাকে। পাঠকের চাহিদামত কখনো পত্রিকা পরিবর্তন ও সংখ্যা বাড়ানো হয়ে থাকে। প্রতিকূল আবহাওয়া ব্যতীত প্রতিদিন মুক্তচিন্তার পাঠক শক্তি ঔষধালয়ের পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ইতোপূর্বে অনিয়মিতভাবে হলেও *ভারত বিচিত্রা*র প্রতিটি সংখ্যা পাঠকের উদ্দেশ্যে আসত। পাঠক *ভারত বিচিত্রা* পাঠ করে তাদের জ্ঞানভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ করতে পারতেন। শেষ সংখ্যা ছিল নভেম্বর-ডিসেম্বর/১২ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সংখ্যা।

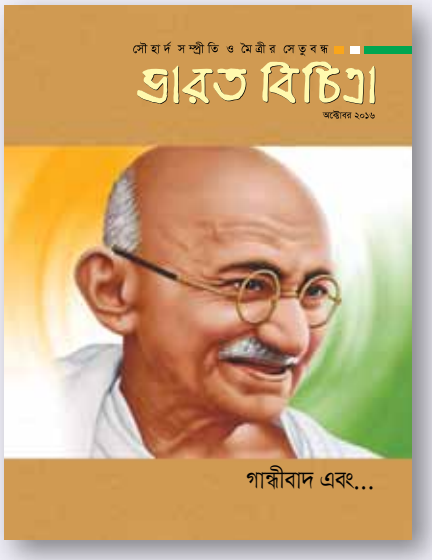

অনেকদিন পাঠক *ভারত বিচিত্রা*পাঠে বঞ্চিত। প্রতিদিনের ভারত সম্পর্কে জানার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে *ভারত বিচিত্রা* শক্তিশালী সহায়ক। নিয়মতিভাবে *ভারত বিচিত্রা* পাঠিয়ে পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করি।

শ্রীদাম দাস
শাখা পরিচালক, শক্তি ঔষধালয়
কালীবাড়ি মোড়, নীলফামারী

আকাঙ্ক্ষা উজিয়ে উঠল

১৯৯৮ সাল থেকে *ভারত বিচিত্রা*র পাঠক আমি। বলা যায় আমার নিত্যসঙ্গী ছিল *ভারত বিচিত্রা*। আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো বইয়ের দোকান, স্টেডিয়াম মার্কেট, রাজশাহীর সাহেব বাজারের পুরনো বইয়ের দোকান– এ-সব জায়গা থেকে ৫ টাকা দিয়ে এক-একটা *ভারত বিচিত্রা* কিনতাম। পছন্দ হলে একসঙ্গে অনেকগুলোও নিতাম। কখনো আবার কোন কোন স্যারের রুমে গেলে নতুন সংখ্যা দেখে লোভ হত, হাতে নিয়ে যতটা পড়া যায় পড়তাম। অনেকবার লিখতে চেয়েছি, পেতে চেয়েছি *ভারত বিচিত্রা*, কিন্তু হয়নি। অনেকদিন পর, কয়েকদিন আগে বাগেরহাটের এক আইনজীবীর ব্যক্তিগত চেম্বারে আবিষ্কার করলাম *ভারত বিচিত্রা*র জুলাই ২০১৩ সংখ্যা, অত্যন্ত প্রিয় পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষকে নিয়ে যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন। ভেতরে দেখলাম আকর্ষণীয় কিছু লেখা। নতুন করে আকাঙ্ক্ষা উজিয়ে উঠল। পাঠক হিসেবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তো বটেই, লেখক হিসেবে লেখার বাসনাও। নিয়মিত হাতে পাওয়ার যোগ্যতা আমার আছে কিনা জানি না, তবে পেলে কৃতজ্ঞ থাকব।

কুমার দীপ প্রভাষক
সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাগেরহাট

সম্পাদকীয়

গত কয়েকবছর ধরে বাংলাদেশের শত শত তরুণ রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন। এইসব তরুণ প্রতিভাবান– সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। নিকট অতীতে তো বটেই, দূর অতীতেও বিরল ভারতের বাঙালি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কুশল বিনিময়ের সুযোগ পেতে তাঁরা সবসময়ই উদ্গ্রীব থাকেন। প্রতিবারই রাষ্ট্রপতি তাঁদের দিল্লিতে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান– ভারতের ঐতিহ্যবাহী আতিথেয়তায় তাঁদের বরণ করে নেন, ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখবার সুযোগ করে দেন। প্রাণোচ্ছল যুবক-যুবতীরা দেশে ফিরে তাঁদের স্বপ্নস্মৃতি রোমন্থন করেন, কখনও কখনও পত্রিকায় সে-সব ভ্রমণিকা পত্রস্থ করার বাসনা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতির সান্নিধ্যপ্রাপ্ত এবারের তরুণদলের অন্যতম মো. রফিকুল ইসলাম, পিয়াস মজিদ যাঁর লেখকনাম, একটি ভ্রমণালেখ্য পাঠিয়েছেন *ভারত বিচিত্রার* পাঠকদের জন্য– আশা করি ভাল লাগবে।

১৯৩৫ সালের ১১ ডিসেম্বর বীরভূমের মীরাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আধুনিক ভারতের এই প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি। সেই অজ পাড়াগাঁ থেকে দিল্লির অভিজাত রাইসিনা হিলের জমকালো রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে পৌঁছনোর যাত্রাপথ নিতান্ত কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তবু এই মেধাবী, প্রতিভাবান মানুষটি সেই অলোকসামান্য স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছেন তাঁর অনমনীয় মনোবল, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আর হার-না-মানা অসম্ভব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দিয়ে। *ভারত বিচিত্রার* তরুণ পাঠকদের কাছে তাঁর জীবনালেখ্য অনুকরণীয় পাথেয় হতে পারে।

অফিস স্থানান্তরের কালক্ষেপে ভারত বিচিত্রার চলতি সংখ্যা নভেম্বর-ডিসেম্বর যুগ্মসংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। অনিবার্য কারণেই তাই নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস দুটির প্রতি যথার্থ সুবিচার করা গেল না। অনেক লেখা মুদ্রণের জন্য মনোনীত হয়েও স্থানাভাবে পত্রস্থ করা সম্ভব হল না। এতে পাঠক-লেখক উভয়েই বঞ্চিত হলেন সন্দেহ নেই– আমাদের সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে আশা করি সবাই বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

নভেম্বরের জাতক মৌলানা আজাদের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৮ সালে, মক্কায়। আধুনিক ভারত বিনির্মাণে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। আজ যে ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বসভায় নিজের আসন করে নিয়েছে, তার সূত্রপাত মৌলানার হাতেই। ধর্ম সম্পর্কে নির্মোহ এই মানুষটি ভারতে একটি সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা উপহার দিয়েছিলেন। ধর্ম বিশ্বাস মানুষের নিজস্ব। এর সঙ্গে রাজনীতিকে জড়ালে কী হয়, আজকের দুনিয়ায় তার উদাহরণ ভুরিভুরি। ভারতের মত অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন দেশে তিনি ধর্মকে রাজনীতি-শিক্ষানীতি থেকে দূরে রেখে যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, আজ সর্বক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতিতে তা প্রতিফলিত হচ্ছে। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলানা আজাদের অভিপ্রায়টি যদি কাজে লাগানো যেত, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য অনেকখানি কমে যেত, সন্দেহ নেই।

বিদেশমন্ত্রী শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ অনেক দিন ধরে গুরুতর অসুস্থ। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের মাননীয় হাই কমিশনার ও হাই কমিশনের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং *ভারত বিচিত্রার* সংশ্লিষ্ট সবাই পত্রিকাটির অগণিত পাঠক-পাঠিকা-গুণগ্রাহী ও বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতি তাঁর আশু রোগমুক্তি কামনা করে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করার অনুরোধ জানাচ্ছেন। চলতি সংখ্যায় এই প্রতিভাময়ী, মিতবাক, হাস্যোজ্জ্বল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ওপর একটি নাতিদীর্ঘ রচনা পত্রস্থ হল, আশা করি পাঠকদের ভাল লাগবে।

অনিবার্য কারণবশত ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনি 'চিলিকা হ্রদের দেশে' আর পত্রস্থ করা সম্ভব হচ্ছে না।

আঞ্চলিক সমীকরণে ব্রিকস্ এন্ড বিমস্টেক আউটরিচ শীর্ষ সম্মেলন: নিরাপত্তা ও উন্নয়ন ইন্টারফেস

ঢাকার ইনস্টিটিউট অফ কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের সেমিনারে শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

৩১ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকার ইনস্টিটিউট অফ কনফ্লিক্ট, ল এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে আয়োজিত এক সেমিনারে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা উপরোক্ত শিরোনামে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং আইসিএলডিএস-এর চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত মুহম্মদ জমির, নিরাপত্তা বিশ্লেষক ও আইসিএলডিএস-এর নির্বাহী পরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) মো. আবদুর রশীদ, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সভাপতি ও আইসিএলডিএস-এর উপদেষ্টা আবদুল ওয়াদুদ দারা এমপি, পররাষ্ট্রবিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও আইসিএলডিএস-এর উপদেষ্টা মিসেস মাহজাবিন খালেদ, *ভোরের কাগজ*-এর সম্পাদক ও আইসিএলডিএস-এর পরিচালক শ্যামল দত্ত, একাত্তর টেলিভিশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আইসিএলডিএস-এর পরিচালক মোজাম্মেল বাবু, পিপলস্ গ্রুপের চেয়ারম্যান, এফবিসিসিআই-এর সাবেক পরিচালক ও আইসিএলডিএস-এর পরিচালক কে এম জামান রোমেল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। হাই কমিশনার বলেন, '১৫-১৬ অক্টোবর ২০১৬ ভারতের গোয়ার ৮ম ব্রিকস্ শীর্ষ সম্মেলনে প্রথমবারের মত বিমস্টেক আউটরিচ বৈঠকের আয়োজন করা হয় যেখানে ৭টি বিমস্টেক দেশের (বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, নেপাল ও থাইল্যান্ড) নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন।'

শ্রী শ্রিংলা বলেন,'ব্রিকস্ গ্রুপিং বিশ্বের ৫টি প্রধান অর্থনীতিকে একত্রিত করেছে যা বিশ্ব জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ (৩৬০কোটি); ১৬.৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্মিলিত জিডিপিসহ বিশ্ব জিডিপি-র ২২ শতাংশ; ৪ ট্রিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা মজুত এবং বিশ্ব বাণিজ্যের ১৭ শতাংশ সমন্বয়ে সৃষ্ট। ৫টি দেশই জি-২০ সদস্য। গোল্ডম্যান স্যাচ ২০০১ সালে প্রথম এ শব্দটি চয়ন করেন এটা বোঝাতে যে, ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চিন আগামী ৫০ বছরে সম্মিলিতভাবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ অর্থনীতিতে পরিণত হবে। ২০১৫ সালে আন্তঃব্রিকস্ বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২৫ হাজার কোটি ডলার।

'২০০৬ সালে ইউএনজিএ-র পাশাপাশি ব্রিকস্ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রথম বৈঠকে প্রথম এ গ্রুপিংটি গঠিত হয় এবং ২০০৯ সালে রাশিয়ায় প্রথম ব্রিকস্ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০১১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা এ গ্রুপিংয়ে যোগ দেয়। ২০১২ সালে ভারত প্রথমবার এবং ২০১৬ সালে দ্বিতীয়বারের মত ব্রিকস্ শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করল।

'ব্রিকস্ গ্রুপিং শুধুমাত্র একটি অর্থনৈতিক গ্রুপিং নয়, এটি একবিংশ শতাব্দীর গ্লোবাল গভর্ন্যান্সের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রতিফলন। এর

ছবি পরিচিতি (ঘড়ির কাঁটার দিকে)
১৫-১৬ অক্টোবর ২০১৬ গোয়ায় ভারতের চেয়ারম্যানশিপে অনুষ্ঠিত ৮ম ব্রিকস্ ব্রিকস্-বিমস্টেক আউটরিচ শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ॥ ব্রাজিল, চিন, রাশিয়ার প্রতিনিধিবর্গ এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব শাহরিয়ার আলমের সঙ্গে সম্মেলনের লোগো উন্মোচন করছেন হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ॥ ভারতের গোয়ায় ব্রিকস্-বিমস্টেক আউটরিচ শীর্ষ সম্মেলনে পৌঁছলে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিলার অভ্যর্থনা জ্ঞাপন

লক্ষ্য বিশ্বের সামনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পথ অনুসন্ধান এবং অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও বৈশ্বিক স্থাপত্যের লক্ষ্যে কাজ করা। হস্তক্ষেপহীন, সমতা ও পারস্পরিক উপকারের ভিত্তিতে ব্রিকস্‌দেশসমূহ তাদের ব্যবসায় পরিচালনা করেছে। সন্ত্রাস আজ বিশ্বের সামনে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ এবং এ বছরের ব্রিকস্‌-বিমস্‌টেক শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাস যে সমগ্র মানবসভ্যতার জন্য হুমকিস্বরূপ এবং সম্মিলিতভাবে এর সামাল দেওয়া প্রয়োজন এটা স্বীকার করে কিভাবে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা যায় সে-সম্পর্কে মতবিনিময় করেন।

'আমন্ত্রিত আফ্রিকান নেতৃবৃন্দের থেকে ব্রিকস্‌ নেতৃবৃন্দের সরে আসার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা ২০১৩ সালে ডারবানে ৫ম শীর্ষ সম্মেলনে ব্রিকস্‌-আউটরিচ সংলাপের সূচনা করেছিল। তারপর থেকে চর্চাটি চলে আসছে। গত বছর যখন রাশিয়া উফায় শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে, তখন ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় ও তুর্কমেনিস্তানের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আউটরিচ থেকে বিমস্‌টেক নেতৃত্ব ঐতিহাসিক। বিমস্‌টেক সদস্য দেশগুলো অভিন্ন লক্ষ্যের শরিক– দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নিজেদের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। বিমস্‌টেক দেশসমূহ সংযোগ, সহযোগিতা এবং নিজেদের মধ্যে জনগণে-জনগণে যোগাযোগের উন্নতির জন্যে কাজ করছে। বিমস্‌টেকের মত আঞ্চলিক গ্রুপিংয়ের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে এবং আউটরিচ বৈঠক ছিল বিমস্‌টেক দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব নবায়ন এবং ব্রিকস্‌ ও বিমস্‌টেক দেশসমূহের মধ্যে যৌথভাবে ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক বন্ধন ও বিনিয়োগ সহযোগিতা প্রসারের সম্ভাবনা খুঁজে দেখার এবং অন্যদিকে শান্তি, উন্নয়ন, গণতন্ত্র এবং সমৃদ্ধির অভিন্ন লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়ার একটা সুযোগ।

নারীদের জন্য বিশেষ ভিসা প্রদানের সাম্প্রতিক ঘোষণা অনুযায়ী ভিসা প্রার্থী হাস্যোজ্জ্বল নারীদের প্রথম ব্যাচের সঙ্গে কথা বলছেন হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। নারীরা ভারতে গমনেচ্ছু তাদের সঙ্গী পারিবারিক সদস্যদের পক্ষে ভ্রমণ ভিসা আবেদনও জমা দিতে পারবেন। আবেদনের সময় নারী আবেদনকারী এবং ভিসাপ্রার্থী তাদের পরিবারবর্গের নিশ্চিত বিমান টিকেট থাকতে হবে (প্রবেশের সময় দেখাতে হবে)। স্কিমটি ভারতীয় ভিসা আবেদন কেন্দ্র সেক্টর ৭, সড়ক ১৮, বাড়ি ৫৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০-এ চালু আছে

'ভারত ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ার কাছ থেকে ব্রিকস্‌-এর চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করে। ২০১৬ সালে ভারতের ব্রিকস্‌ সভাপতিত্বের থিম ছিল বিআরআইসিএস (বিল্ডিং রেসপনসিভ, ইনক্লুসিভ এন্ড কালেকটিভ সল্যুশানস) অর্থাৎ দায়িত্বশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সম্মিলিত সমাধান তৈরি। আমাদের সভাপতিত্বকালে ভারত সংসদীয়, মন্ত্রী পরিষদীয়, সরকারি, ট্রাক-টু উদ্যোগসহ ১১৫টি ইভেন্টের আয়োজন করে। ২০১৬ সালে ব্রিকস্‌ সভাপতিত্বকালে ভারত 'থ্রিসি বা ফোর সি' গৃহীত পঞ্চমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। এগুলি হচ্ছে: (ক) আরও গভীর ও টেকসই ব্রিকস্‌ সহযোগিতাকল্পে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ; (খ) পূর্ববর্তী শীর্ষ সম্মেলন থেকে আসা সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন; (গ) বিদ্যমান সহযোগিতা প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও মিল খোঁজা (ঘ) উদ্ভাবন অর্থাৎ ব্রিকস সহযোগিতার পূর্ণ সদ্ব্যবহারে জি২জি, ট্রাক-টু, বি২বি এবং পি২পি স্তরে নতুন সহযোগিতা প্রক্রিয়া; (ঙ) অব্যাহত রাখা অর্থাৎ পরস্পর-স্বীকৃত বিদ্যমান ব্রিকস সহযোগিতা প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের-জনগণে যোগাযোগ এবং এগুলিকে শক্তিশালী করতে সারাবছর ধরে একাধিক অনুষ্ঠান যেমন ব্রিকস চলচ্চিত্র উৎসব; অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল টুর্নামেন্ট; যুব শীর্ষ সম্মেলন প্রভৃতির আয়োজন করা।

'শীর্ষ সম্মেলন শেষে ব্রিকস নেতৃবৃন্দের

বামঃ ৩১ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের নতুন চ্যাঞ্চেরি কমপ্লেক্সের মাল্টিপারপাস হলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৪১তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে 'সর্দার প্যাটেলের জীবন ও সময়' শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা তাঁর বক্তৃতায় স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ভারতের একত্রিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় সর্দার প্যাটেলের ভূমিকা তুলে ধরেন। হাই কমিশনের কর্মকর্তা, প্রবাসী ভারতীয় ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এ অনুষ্ঠানে 'এ ম্যান ইন সাইলেন্স– সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল' শীর্ষক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়

ডানঃ ২৬ নভেম্বর ২০১৬ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে ভারতীয় হাই কমিশন ও বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি আয়োজিত ভারতের সংবিধান দিবসবিষয়ক আলোচনাসভায় শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, বাংলাদেশ আইন কমিশনের সদস্য ড. শাহ আলম, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মিজানুর রহমান, বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতির সভাপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. এ কে আজাদ চৌধুরীর বক্তব্য প্রদান

২১-২৯ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ঢাকার *লা মেরিডিয়ান* হোটেলে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ও লা মেরিডিয়ান হোটেলের সঙ্গে 'মাই ডটার ইজ প্রেশিয়াস' শীর্ষক কাব্য রাজেশ ও রাজেশ রামাকৃষ্ণাণের এক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রদর্শনীতে ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় তোলা আলোকচিত্রে পিতা ও কন্যাকে তুলে ধরা হয়। কন্যা শিশুর শিক্ষার জন্য অর্থ উত্তোলনের লক্ষ্যে কাব্য এবং রাজেশ বাংলাদেশভিত্তিক এনজিও গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের অংশীদারিত্বে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে

গোয়া ঘোষণা গ্রহণ করেন। ৮ম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে অভিন্ন ও পারস্পরিক উপকারমূলক বিষয়াদি সামনে এগিয়ে নিতে একটি নতুন উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় ব্রিকস রেটিং এজেন্সি, রেলওয়ের গবেষণা নেটওয়ার্ক এবং কৃষি গবেষণা মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা। নেতৃবৃন্দ বিশ্ব অর্থনীতি এবং আন্তার্জাতিক অর্থনৈতিক নির্মাণ মজবুত করতে নতুন উন্নয়ন ব্যাংক (এনডিবি) ও কনটিনজেন্ট রিজার্ভ এ্যারেঞ্জমেন্ট (সিআরএ) চালু; ব্রিকস-এর নতুন উন্নয়ন ব্যাংকের আফ্রিকা আঞ্চলিক কেন্দ্র (এআরসি) চালু করার কাজে অগ্রগতি; নতুন উন্নয়ন ব্যাংকের প্রথম ঋণের অনুমোদন বিশেষ করে ব্রিকস দেশসমূহের নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রচেষ্টা এবং এডিবি-র গ্রিন বন্ডের প্রথম সেট প্রবর্তনে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ৮ম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আয়তন ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু প্রসারিত হচ্ছে এবং এই বোধ দৃঢ় হচ্ছে যে, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও নিরাপত্তার ওপর বৈশ্বিক উন্নয়ন ও শান্তি নির্ভরশীল। এই প্রেক্ষিতে, ২০১৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লিতে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় প্রথম ব্রিকস যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হাই কমিশনার বলেন, 'বিমস্‌টেক-এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বের ২টি দ্রুততম প্রবৃদ্ধিশীল অঞ্চল– দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। ১৯৯৭ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অর্থনৈতিক সংকটকালে থাইল্যান্ড প্রথমে বিমস্‌টেক-এর ধারণা দেয়। বিমস্‌টেকে আছে দেড়শো কোটি মানুষ, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২১ শতাংশ; সম্মিলিত জিডিপি ২.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৪৩-৫৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা। এর লক্ষ্য হচ্ছে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতিতে গতিবেগ সঞ্চার ও সক্রিয় সহযোগিতা।

'১৬ অক্টোবর ২০১৬ আউটরিচ বৈঠককালে বিমস্‌টেক দেশসমূহের নেতৃবৃন্দ, রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানেরা এক রিট্রিট সেটিংয়েও বসেছিলেন। ব্রিকস্-বিমস্‌টেক আউটরিচ বৈঠকে সকল নেতা কীভাবে সন্ত্রাসের যন্ত্রণা মোকাবেলা করা যায়, সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সন্ত্রাস আমাদের অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে রয়েছে বলে তারা স্বীকার করেন এবং এর সকল আকার-প্রকার মোকাবিলায় দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। যে-কোনভাবে যে-কোন প্রকারে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পক্ষে সাফাই গাওয়ার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না বলে তারা মন্তব্য করেন। নেতৃবৃন্দ স্বীকার করেন যে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুধু সন্ত্রাসী, সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও নেটওয়ার্ক ছত্রভঙ্গ কিংবা ধ্বংস করা নয়, তাদের চিহ্নিত করা, আইনের আওতায় আনা এবং যে-সব দেশ সন্ত্রাসবাদে উৎসাহ, সমর্থন ও অর্থ যোগায় এবং সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেয় সে-সব দেশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তথ্য ইন্টেলিজেন্স আদান-প্রদান এবং আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা প্রধানদের বাৎসরিক বৈঠক আমাদের নেতৃবৃন্দের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

তিনি বলেন, 'আউটরিচ বৈঠকে আমাদের নেতৃবৃন্দ আমাদের অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যোগাযোগের প্রয়োজনীতার কথা স্বীকার করেন। বৈঠক থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফল পাওয়া গেছে। একটা হচ্ছে, যানবাহন চলাচলে ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট ও চলাচল সংক্রান্ত বিমস্‌টেক ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি। আরেকটি হচ্ছে, বিমস্‌টেক বাণিজ্য জোরদারকরণ চুক্তির লক্ষ্যে কাজ করা। আমরা সবাই দুর্যোগ প্রবণ দেশ। আমাদের সবাই কোন-না-কোন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়ি। কাজেই এক্ষেত্রে সহযোগিতা করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের নেতৃবৃন্দ এক্ষেত্রে সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্রী শ্রিংলা বলেন, 'বিমস্‌টেক নেতৃবৃন্দ বিমস্‌টেক অবাধ বাণিজ্য চুক্তিবিষয়ক আলোচনা দ্রুত করতেও সম্মত হয়েছেন। আমাদের বিমস্‌টেক উপকূলীয় জাহাজ চলাচল চুক্তি এবং বিমস্‌টেক জ্বালানি বাণিজ্য সহযোগিতা, প্রযুক্তি স্থানান্তরের জন্য একটি বিমস্‌টেক সেন্টার স্থাপন, একটি বিমস্‌টেক অর্থনৈতিক, কারিগরি ও অবকাঠামো সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনার উদ্যোগ নেওয়া উচিত বলেও সিদ্ধান্ত হয়েছে। কাস্টমস্ বিষয়ে বিমস্‌টেক পারস্পরিক সহায়তার ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে। এ সূত্রে বাণিজ্য জোরদারকরণ চুক্তি দ্রুততর করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কাস্টমস্ বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা বাণিজ্য জোরদারকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।' তিনি কৃষি সহযোগিতাকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এবং এক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে বিমস্‌টেক নেতৃবৃন্দের 'বিমস্‌টেক বিখ্যাত মানুষদের দল' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ দলে গতিবেগ সঞ্চারে নতুন শক্তি, নতুন ভাবনা যোগ করবে বলে মন্তব্য করেন। হাই কমিশনার বলেন, 'বিমস্‌টেক রিট্রিট মিটিংয়ের দলিলে অন্য যে-সব সহযোগিতার বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে, তার মধ্যে আছে আমাদের অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তা ও টেকসই জীবিকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাৎস্য সংক্রান্ত টেকসই উন্নয়নে সহযোগিতা; ব্লু ইকোনমি বিশেষ করে অ্যাকুয়া কালচার, উপকূলীয় জাহাজ চলাচল, ইকো-ট্যুরিজম প্রভৃতি ক্ষেত্রের উন্নয়নে সহযোগিতা; বিমস্‌টেক এনার্জি সেন্টার দ্রুত চালু করার লক্ষ্যে জ্বালানি খাতে সহযোগিতা এবং গ্রিড আন্তঃসংযোগ চুক্তি স্বাক্ষর।

তিনি বলেন, 'বিমস্‌টেক দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতায় ব্যাপ্তি ও সুযোগ অফুরান– এটি আঞ্চলিক উন্নয়নের অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা এবং এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতার অভিন্ন মুখবন্ধ হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিমস্‌টেক দেশসমূহের আউটরিচ এবং আউটরিচের ফলস্বরূপ প্রাপ্ত দলিল আমাদের সামনে সুনিশ্চয় এক উচ্চাভিলাষী করণীয় স্থাপন করেছে, যার আশু বাস্তবায়নে সদস্য দেশগুলির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। আমাদের অঞ্চলের রূপান্তর গুরুত্বপূর্ণ এবং এ লক্ষ্যে আমাদের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন।'

● নিজস্ব প্রতিবেদন

সুষমা স্বরাজ

প্রতিভাময়ী রাজনীতিক

তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ার একদিকে যেমন উজ্জ্বল, তেমনি ঘটনাবহুল। মাত্র ২৫ বছর বয়সে হরিয়ানার শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী, সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রীর মত সম্মানজনক পদ অলংকৃত করে এই প্রতিভাময়ী রাজনীতিক ভারতের একমাত্র নারী সাংসদ হিসেবে আউটস্ট্যান্ডিং পার্লামেন্টারিয়ান অ্যাওয়ার্ড লাভের এক বিরল নজির স্থাপন করেন। এর পেছনে ছিল সাতবার লোকসভার ও তিনবার বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার অনন্য কৃতিত্ব। সবশেষে তাঁর শিরেস্ত্রাণে যুক্ত হয়েছে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রণালয়ের মত মহার্ঘ পালক। এই মিতবাক, হাস্যোজ্জ্বল মানুষটি আর কেউ নন, একমেবঅদ্বিতীয়ম্ শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ।

তাঁর জন্ম হরিয়ানার আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। বাবা হরদেব শর্মা ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রভাবশালী সদস্য। আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট এলাকার সনাতন ধর্ম কলেজ থেকে স্নাতক এবং চন্ডিগড়ের পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন সুষমা। হরিয়ানা সরকারের ভাষা বিভাগ আয়োজিত প্রতিযোগিতায় পর পর তিনবার সেরা বক্তা হবার গৌরব অর্জন করেন তিনি।

১৯৭০-এর দেশকে তিনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে যোগ দেন। ১৯৭৩ সালে তিনি ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে প্রাকটিশ শুরু করেন। এ বছরের ১৩ জুলাই তিনি সহকর্মী স্বরাজ কুশলকে বিয়ে করেন। স্বরাজ ছিলেন বিশিষ্ট সমাজবাদী নেতা জর্জ ফার্নান্ডেজের প্রিয়ভাজন। সে-সময় দেশজুড়ে চলছিল জরুরি অবস্থা। ১৯৭৫ সালে তিনি ফার্নান্ডেজের আইনি সুরক্ষাদলে অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণের সর্ব বিপ্লব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। জরুরি অবস্থার অবসানে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন এবং ক্রমে বিজেপি-র সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

১৯৭৭ সালে যখন আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট আসন থেকে হরিয়ানা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন, তাঁর বয়স মাত্র ২৫। তিনি মুখ্যমন্ত্রী দেবীলালের নেতৃত্বে জনতা পার্টি সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ১৯৭৯ সালে ২৭ বছর বয়সে তিনি হরিয়ানা জনতা পার্টির সভাপতি হন। পরে দ্বিতীয় মেয়াদে ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি-লোকদল কোয়ালিশান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৮ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হন। দ্রব্যমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে বিজেপি সরকারের পতন হলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে জাতীয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৯০ এর এপ্রিলে তিনি রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৬-এ দক্ষিণ দিল্লি আসন থেকে একাদশ লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে তিনি অটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রীসভায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। তবে সে-সরকার টিকেছিল মাত্র ১৩ দিন।

১৯৯৮ সালের মার্চে দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে বাজপেয়ী সরকারের দ্বিতীয় দফায় তিনি আবার কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের দায়িত্ব লাভ করেন, সঙ্গে টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত দায়িত্ব। এ মেয়াদে তিনি চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেন, ফলে ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যাংক ঋণলাভের সুবিধা অর্জন করে। এছাড়া তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে কমিউনিটি রেডিও প্রবর্তন করেন।

১৯৯৯ সালের ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি সুষমাকে কর্নাটকের বেলারি আসনে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দেয়। এটি কংগ্রেসের বাঁধা আসন। ১৯৫১-৫২ সালের নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেস কখনো এ আসনে হারেনি। কন্নড় ভাষায় মাত্র ১২ দিনের প্রচারাভিযানে তিনি ৩ লাখ ৫৮ হাজার ভোট পান। হেরে যান তিনি, তবে মার্জিন ছিল মাত্র ৭%।

২০০০ সালে তিনি উত্তর প্রদেশ থেকে আবার রাজ্যসভার সদস্য থেকে সংসদে ফিরে আসেন। উত্তরাখন্ড রাজ্য গঠনে তাঁর সবিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁকে পুনরায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০০৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তাঁকে দেওয়া হয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব; ছিলেন ২০০৪ সালের মে পর্যন্ত। স্বাস্থ্যমন্ত্রী থাকাকালে তিনি মধ্যপ্রদেশের ভূপাল, ওড়িশার ভুবনেশ্বর, রাজস্থানের যোধপুর, বিহারের পাটনা, ছত্তিশগড়ের রায়পুর ও উত্তরাখণ্ডের হৃষিকেশে ৬টি অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এআইআইএমএস) প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০৪-এর সাধারণ নির্বাচনে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স সরকার পরাজিত হয়। মধ্যপ্রদেশ থেকে ২০০৬ সালের এপ্রিলে তিনি তৃতীয়বারের মত রাজ্যসভায় পুনঃনির্বাচিত হন এবং ২০০৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যসভায় বিরোধী দলীয় উপনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৯ সালের পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে তিনি মধ্যপ্রদেশের বিদিশা আসন থেকে সর্বোচ্চ ৪ লাখ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন এবং বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে লালকৃষ্ণ আদবানীর স্থলাভিষিক্ত হন। এরপর ২০১৪-র সাধারণ নির্বাচনে তাঁর দলের বিপুল বিজয়ের পর তিনি নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিদেশমন্ত্রকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। জাতীয় সংসদে তিনিই প্রথম ও একমাত্র নারী সাংসদ যিনি 'আউটস্ট্যান্ডিং পার্লামেন্টারিয়ান অ্যাওয়ার্ড' অর্জনের বিরল কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

তাঁদের একমাত্র কন্যা বাঁশরি অক্সফোর্ড থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর ইনার টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেছেন।

১০ ডিসেম্বর ২০১৬ এআইআইএমএস-এ তাঁর কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়। অস্ত্রোপাচার সফল হয়েছে। দ্রুত আরোগ্যের জন্য তিনি দেশবাসীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন।

• নিজস্ব প্রতিবেদন

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম। এর ব্যাপ্তি ছিল ২৫ মার্চ হতে ১৬ ডিসেম্বর প্রায় ৯ মাস। রক্তক্ষয়ী এই স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। এই যুদ্ধ প্রসঙ্গে দুই-এক কথায় কিছুই বলা যায় না। এ যুদ্ধ ছিল সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের যুদ্ধ। বাঙালি জাতির মুক্তির যুদ্ধ। ১৯৭১ সালের আগে বাংলাদেশ নামে কোন দেশের অস্তিত্ব ছিল না। তখন বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের একটি প্রদেশ– নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। বর্তমান পাকিস্তান ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। ১৯৪৭-এ দেশভাগের সময় শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে হাজার মাইল দূরত্বের দু'টি দেশকে একটি দেশ হিসেবে ভাগ করে দেওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় শাসনকাজ পরিচালিত হত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। প্রথম থেকেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর একচোখা নীতি প্রকাশ পেতে থাকে চরমভাবে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তৎকালীন মুসলিম লিগ সরকারের ওপর। এর প্রতিফলন ঘটে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শের-এ-বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচনে বিপুল বিজয় লাভ করে সরকার গঠন করে। কিন্তু ১৯৫৪ সালের ৩০ মে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন জারি করে। স্বায়ত্তশাসন থেকে বঞ্চিত করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ রমনা রেসকোর্স ময়দানে ভারতীয় মিত্রবাহিনির কাছে পাকিস্তানী বাহিনির আত্মসমর্পণ

১৯৬৬ সালে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৬ দফা দাবি পেশ করেন। ছয় দফা দাবির মূল উদ্দেশ্য ছিল– পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র এবং ছয় দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে এই ফেডারেশনের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। পরবর্তীকালে এই ৬ দফা দাবিকে কেন্দ্র করে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনকে স্তিমিত করতে সরকার মে মাসে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। ১৯৬৮ সালে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো কিছু বাঙালি সেনা, নৌবাহিনির সদস্য ও প্রশাসনের পদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে একটি ষড়যন্ত্রমূলক মামলা করা হয়। ইতিহাসে যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। এই মামলার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন পরবর্তীকালে

গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

১৯৬৯ সালে স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি পেশ করেন। কিন্তু তৎকালীন সামরিক শাসক আইয়ুব খান এই দাবি অগ্রাহ্য করে আন্দোলনকারীদের ওপর দমন-পীড়ন শুরু করেন। এই আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনায় প্রাণ হারান ছাত্রনেতা আসাদ, কিশোর মতিয়ুর, সার্জেন্ট জহুরুল হক, শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহাসহ আরো অনেকে। এইসব ঘটনায় সরকারের ওপর চাপ বৃদ্ধি পেলে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল বন্দীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। জনরোষে আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন এবং ২৪ মার্চ তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভের অবসান হয়।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় পরিষদের নির্বাচন এবং ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের ৫টি প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন। উভয় পরিষদের নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন অধিকার করে অন্যদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ৮৮ আসন অধিকার করে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা লাভ করে।

২৫ মার্চের আগে ঢাকা থেকে সব বিদেশী সাংবাদিককে বের করে দেওয়া হয়। সে রাতেই পাকিস্তান বাহিনি শুরু করে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে হত্যাযজ্ঞ। যদিও এই হত্যাযজ্ঞের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ঢাকা, তবু সারা দেশে নির্বিচার বাঙালি নিধন শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো ছিল তাদের বিশেষ লক্ষ্য। পাকিস্তান সেনাবাহিনি একমাত্র হিন্দু আবাসিক হল জগন্নাথ হল পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। এতে ৬০০ থেকে ৭০০ আবাসিক ছাত্র নিহত হয়। যদিও পাকিস্তান সেনাবাহিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ধরনের ঠাণ্ডা মাথার হত্যাকাণ্ডের কথা অস্বীকার করে, তবে হামিদুর রহমান কমিশনের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ে

পাকিস্তান সেনাবাহিনি ব্যাপক শক্তি প্রয়োগ করেছিল। জগন্নাথ হল এবং অন্যান্য ছাত্রহলে পাকিস্তানীদের হত্যাযজ্ঞের চিত্র ভিডিওটেপে ধারণ করেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (বর্তমান বুয়েট)-র প্রফেসর নূর উল্লাহ।

পুরো বাংলাদেশেই হিন্দু এলাকাগুলো বিশেষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মধ্যরাতের আগেই ঢাকা পুরোপুরি জ্বলছিল, বিশেষভাবে পুবের হিন্দুপ্রধান এলাকাগুলো। ১৯৭১ সালের ২ আগস্ট প্রকাশিত টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়, হিন্দুরা, ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী মোট শরণার্থীর তিন-চতুর্থাংশ, পাকিস্তানী সামরিক বাহিনির ক্রোধ ও আক্রোশের শিকার হন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী হানাদার বাহিনির হাতে গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হবার পূর্বে ২৫ মার্চ রাত ১২ টার পর (অর্থাৎ ২৬ মার্চ) টিএন্ডটি ও ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) ওয়্যারলেসের মাধ্যমে মেসেজে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৫৬)। ২৫ মার্চ রাতের হত্যাযজ্ঞে আওয়ামী লীগের অনেক প্রধান নেতা ভারতে আশ্রয় নেন। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের কয়েকজন কর্মকর্তা ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান প্রথম শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি মাইকিং করে প্রচার করেন। পরে ২৭ মার্চ রাতে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনির বাঙালি মেজর জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। (সূত্র: মেজর জিয়ার বেতার ঘোষণা এবং বেলাল মোহাম্মদের সাক্ষাৎকার) এ-সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কর্নেল অলি আহমেদ (তৎকালীন ক্যাপ্টেন)। সরাসরি সেনাবাহিনির থেকে আহ্বান পাওয়ার পর সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটে এবং দেশের মানুষ নিশ্চিত হয় যে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমা (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলার অন্তর্গত ভবেরপাড়া গ্রামে। শেখ মুজিবুর রহমানের অনপুস্থিতিতে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে সরকার গঠন করা হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পিত হয় তাজউদ্দীন আহমদের ওপর।

স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনি ও তাদের এ দেশীয় দোসররা যুদ্ধের অন্তিম লগ্নে ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর দেশের কৃতবিদ্য অধ্যাপক, ডাক্তার, শিল্পী, সাংবাদিক, লেখকদের ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। যদিও ২৫ মার্চ থেকেই শুরু হয় বুদ্ধিজীবী হত্যা।

তারপর আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ– ১৬ ডিসেম্বর। রমনার রেসকোর্স ময়দানে ভারতীয় মিত্রবাহিনির কাছে ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বুকে এক নতুন দেশের অভ্যুদয় হয়, বাংলাদেশ যার নাম। ৩০ লাখ শহীদের রক্ত ও দু'লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে লাল-সবুজের পতাকার এই দেশটি বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন।

সূত্র ইন্টারনেট

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে শত তরুণের সাক্ষাৎ

ঐ ন্দ্র জা লি ক অ নু ভ ব

পিয়াস মজিদ

আমাদের ভারতযাত্রার একমাস পর এ লেখা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে এক মাস আগের আমরা আর এই সফরের পরের আমরা ঠিক এক মানুষ নই যেন। হ্যাঁ, বলছি ভারত সরকারের আমন্ত্রণে বাংলাদেশের ১০০ তরুণ-তরুণীর গত ৪-১১ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত আট দিনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ভ্রমণের কথা। প্রাথমিক বাছাই, চূড়ান্তকরণ, সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকরণ আর যাত্রার পূর্বমুহূর্তে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের মান্যবর রাষ্ট্রদূত শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বাসভবনে আমাদের উদ্দেশ্যে যে আনন্দঘন সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় তার সবগুলো পর্বেই একে একে পরিচিত হচ্ছিলাম সহযাত্রী বন্ধুদের সঙ্গে। আমরা কেউ লেখক, কেউ সাংবাদিক, কেউ শিক্ষার্থী, কেউ ক্রীড়াবিদ, কেউ শিল্পী কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে একেকজন বন্ধু ও ভ্রমণপিয়াসী তরুণ-তরুণী। সে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ক্রীড়ামন্ত্রী বীরেন শিকদার ও অন্যান্য অতিথিবর্গ বলছিলেন, ভারত অবস্থানের এক একটি দিনই আমরা সেখানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হব সুতরাং দেশকে, দেশের মানুষ, সংস্কৃতি ও সুকৃতিকে সর্বতোরূপে তুলে ধরাই হবে আমাদের দায়িত্ব। বিষয়টি স্পর্শ করেছে আমাদের, বাড়িয়ে দিয়েছে দায়িত্ববোধও। অতঃপর ৩ ডিসেম্বর যাত্রার ঠিক আগের দিন বাংলাদেশসহ ভারতীয় দূতাবাসের প্রথম সচিব মি. রাজেশ উইকে এবং কল্যাণকান্তি দাশ যখন সফরের খুঁটিনাটি বিষয়াশয় বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তখন থেকেই ক্ষণ গণনা শুরু হয়ে গিয়েছিল আমাদের। দিল্লি, তবে তুমি দূরে নও আর...।

৪ ডিসেম্বর বিমানবন্দরেই বসে গেল ১০০ ভারতযাত্রীর মিলনমেলা। গ্রুপে গ্রুপে সেলফি তোলা আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা কখন শুরু হবে আমাদের বিমানযাত্রা। অবশেষে স্বপ্ন স্পর্শ করল দিগন্ত। গানে-আড্ডায় আকাশ মাত করতে করতে কখন যে ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে, ভারত প্রজাতন্ত্রের রাজধানী, ঐতিহাসিক দিল্লি নগরীতে পৌঁছে গেলাম– টেরই পেলাম না।

এই সফরের অন্যতম লক্ষ্যযোগ্য বিষয় ছিল শৃঙ্খলাবোধ। ১০০ তরুণ-তরুণীর সুষ্ঠু ভ্রমণ নিশ্চিতের জন্যই আমাদের তিনজন বাস-লিডার এবং ৯জন গ্রুপ-লিডারের আওতায় বিন্যস্ত করা হল। ঘটনাক্রমে বর্তমান লেখকও ছিলেন একজন গ্রুপ লিডার ফলে আমরা যে যার বাসে ও গ্রুপে বিভক্ত হয়ে মধ্যাহ্নভোজের উদ্দেশে রওনা হলাম। স্থানীয় খাবারের স্বাদই যেন আমাদের অভ্যর্থনা করল বহু ভাষা-জাতি ও সংস্কৃতিঋদ্ধ ভারতবর্ষের মাটিতে।

তারপর দুপুর না গড়াতেই শুরু হল আমাদের ম্যারাথন ভারতদর্শন। ভারতীয় জাদুঘর, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইন্ডিয়া গেইট, মেট্রোভ্রমণের মধ্য দিয়ে কাটল সফরের প্রথম দিন। জাদুঘরের স্বেচ্ছাসেবক গাইডবৃন্দ ভারতীয় সভ্যতার নিদর্শন সম্পর্কে যেভাবে বর্ণনা করছিলেন তা যেন ছবির মত স্পষ্ট করছিল ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে হারিয়ে যাওয়া সময়। এই জাদুঘরে ঐতিহাসিক উপাদানকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে একদিকে যেমন মিশ্র সংস্কৃতির ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ পরিস্ফুট হয় অন্যদিকে রাজন্যবর্গ থেকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার একটি চলচ্ছবি ফুটে ওঠে। আর গোধূলিবেলায় ইন্ডিয়া গেইটের সামনে সমবেত হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে আমরাও মনে মনে প্রণত হচ্ছিলাম স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রাণোৎসর্গকারী মানুষের স্মৃতির উদ্দেশে। আমার মনে মুহূর্তেই উঁকি দিল নো ওয়ান কিল্ড জেসিকা চলচ্চিত্রের সেই দৃশ্যের কথা; যেখানে হাজার হাজার মানুষ আলোর দীপ জ্বেলে অন্ধকারের বিরুদ্ধে সমবেত-শপথ নেয় ইন্ডিয়া গেইটের আঙিনায়। যাই হোক, ভিড়ের মধ্যে জনান্তিকে একজন বলল, সামনেই ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। তাই এখন থেকেই মানুষের ভিড় বাড়ছে এখানে।

রাতে আমরা যখন আমাদের দিল্লি অবস্থানকালীন আবাস অশোক হোটেলে প্রবেশ করলাম তখন আনন্দ আরও তুঙ্গ স্পর্শ করল। কারণ এই হোটেলের স্থাপত্যশৈলী ও বিন্যাস এক কথায় অপূর্ব ও ধ্রুপদ-ছোঁয়া। যে যার নির্ধারিত রুমে ভাগ হয়ে আবার মিলিত হলাম নৈশভোজে। আনন্দ-হল্লায় ভোজপর্ব সেরে আমি ও আমার রুমমেট রাতুল যখন হোটেলের সামনে পায়চারি করছিলাম তখন ডিসেম্বরের হিমেল হাওয়া, নিশিরাত, হোটেলের আলোকমালা আর দূর আকাশের চন্দ্রাভা– মিলেমিশে এক অপার্থিব ঐন্দ্রজালিক মুহূর্তের মূর্ছনা জন্ম দিয়ে গেল যেন।

৫ ডিসেম্বর। ভোর হতেই জলযোগ সেরে আমাদের গন্তব্য– রাজঘাট। পথে যেতে যেতে বাসের জানালা দিয়ে দেখছিলাম– মানসিংহ মার্গ, আকবর সরণি; ভারতীয় ইতিহাসের বিশিষ্টজনদের নামে স্মারক-সড়কের মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যকে কিভাবে বিভিন্ন রাজপথে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে! খুবই মুগ্ধ হলাম। রাজঘাটে ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করতেই এক পবিত্র-বিধুর অনুভবে ছেয়ে গেল মন। বিশাল এলাকার নিরিবিলি পরিসরে সবুজ ঘাসের ইতিউতি বিভিন্ন ফলকে উৎকীর্ণ গান্ধীজীর বাণী– অহিংসার, সত্যের, শুভর, সার্বজনীন কল্যাণ ও মানবতাবোধের। আর তাঁর শান্ত-সৌম্য সমাধিস্থানের প্রজ্বলিত অগ্নির সামনে শ্রাদ্ধনত চিত্তে দাঁড়িয়ে আমার মনের মঞ্চে আবৃত্তি হচ্ছিল কেবল প্রিয় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা 'ও চিরপ্রণম্য অগ্নি...।'

অতঃপর যাত্রা লালকেল্লা অভিমুখে। মোগল সাম্রাজ্যের বিস্ময়-উদ্রেকী এই কেল্লার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করতে করতে মনে হচ্ছিল এই তো এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাহাদুর শাহ জাফর, কিংবা শায়েরি শোনাচ্ছেন কবি-মহান মির্জা আসাদুল্লাহ খাঁ গালিব। মনে পড়ছিল প্রমথ নাথ বিশীর লেখা লাল কিল্লা বইটির কথাও। পাশেই চাঁদনিচক, কয়েকটি মন্দির আর পুরানা দিল্লির রোমাঞ্চকর হাতছানি। ক্রমশ দিল্লির গভীর, গভীরতরে ঢুকছিলাম আমরা। জামা মসজিদের কথা অনেক শুনেছি। মির্জা গালিবকে নিয়ে নিবেদিত সনেটগুচ্ছ *ধ্বংসস্তূপে কবি* ও *নগর*-এ সৈয়দ শামসুল হক এবং উপন্যাস *যমুনা নদীর মুশরায়রায়* সেলিনা হোসেন এই মসজিদ, পার্শ্ববর্তী বিল্লিমারান গলির কথা বলেছেন বারবার। এই ঐতিহাসিক মসজিদের মনোলোভা কারুকাজ যে কাউকে মুগ্ধ করবে নিঃসন্দেহে। ভাল লাগছিল এটা দেখে যে পশ্চিমা দেশের অনেক ভ্রমণকারী সাগ্রহে মসজিদটি ঘুরে দেখছেন। মসজিদের সামনের সরোবরে রোদ আর ছায়ার খেলা মিলে এক স্বর্গীয় বিভা রচনা করছিল মুহূর্মুহু। আমার কৌতূহলী বিচরণ দেখে মি. রাজেশ উইকে বললেন, উইলিয়াম ডার্লিম্পলের *হোয়াইট মোগলস* পড়েছি কিনা। পড়েছি বলতেই তাঁর সঙ্গে বইটি নিয়ে আলাপ জমে উঠল আর তখনই ঘণ্টা বাজল মধ্যাহ্নভোজ-যাত্রার। পুরানা দিল্লির স্বাদগন্ধে ভরপুর খাবার খাবার চাখতে চাখতে প্রস্তুতি শুধু হয়ে গেল সেই মাহেন্দ্রক্ষণের। ভারত প্রজাতন্ত্রের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত আছে সন্ধ্যায়।

হোটেলে ফিরে চটজলদি তৈরি হয়ে বাংলাদেশের ১০০ তরুণ-তরুণীর গন্তব্য মিলিত হল এক অভিন্ন বিন্দুতে– রাষ্ট্রপতি ভবন, ভারত। ঐতিহাসিক ভবনটির বিশালতা, সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যের চেয়ে বেশি আকর্ষণ করল এ-কারণে যে এই ভবনেই ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত পণ্ডিত, সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণের মত দার্শনিক, ড. এ পি জে আবদুল কালামের মত বিজ্ঞানী, প্রতিভা পাটিলের মত বিদূষীর অবস্থান ছিল। রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের দরবার হলে আগমনের আগের মুহূর্তে ভারতের কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব আমার সঙ্গে কথা বললেন। আমি লিখি জেনে আগ্রহী হয়ে আমাদের সাহিত্য নিয়ে জানতে চাইলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের পরপরই সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশী হলাম– ভারতবর্ষের প্রথম বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে কিছুটা অনন্য সময় অতিবাহন। আমাদের উদ্দেশে বক্তৃতায় তিনি যেমন স্বাগত করলেন আমাদের তেমনি দেশভাগের দুঃখের কথাও বললেন। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা, বঙ্গবন্ধুর কথা তো বললেনই; একইসঙ্গে বললেন বাংলা নাটকের চরিত্রচিত্রণে পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্যের উদ্ভাসনের কথা। বিশেষ করে বললেন ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা'র প্রসঙ্গ। মানচিত্র বিভক্তি যে কখনো বন্ধুত্বের বিভক্তিরেখা টানতে পারে না তা-ও বললেন গুরুত্ব সহকারেই। আপ্লুত হয়ে রইলাম তাঁর অনন্যসাধারণ, হৃদয়স্পর্শী বক্তব্যে।

৬ ডিসেম্বরের কথা জীবনের খাতায় লেখা থাকবে স্মরণীয় পাতা হয়ে। এদিন আমাদের আগ্রাযাত্রা, তাজমহল-অন্বেষা, মমতাজ-শাহ্‌জাহানের সন্নিধান। দিল্লি থেকে সড়কপথে আগ্রা যেতে যেতে ভারতের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগের কিয়দংশ দেখছিলাম আর ভাবছিলাম সে বহুশ্রুত কথাটি যে– পুরো ভারত ভালভাবে দেখা গেলে পৃথিবীদর্শনের স্বাদ পাওয়া যায়। আমাদের বাসে চলছিল কখনও অন্ত্যাক্ষরি গানের খেলা, কখনো বা বিজয়ের মাস ডিসেম্বর স্মরণে দেশপ্রেমের গান। আগ্রা যেতে যেতে টের পাচ্ছিলাম শীতের প্রকোপ; কুয়াশায় ঢেকে আছে সমস্ত চরাচর আর আমরা হিমের গর্ভ ভেদ করে প্রবেশ করছি চিরায়ত মানবমানবীর ঐশ্বরিক প্রেমানুভূতির তাপকেন্দ্র তাজমহলে। ভাবছিলাম এতশত লেখা হয়েছে তাজকে নিয়ে, কতভাবেই না বিশ্লেষণ করা হয়েছে তবু এ যেন চির এক অধরা মাধুরী। আমাদের গাইড ভদ্রলোকটি কী নিপুণ বর্ণনায় ভাস্বর করে তুলছিলেন তাজমহলের ইতিহাস– ভাবলে অবাক মানতে হয়। পূর্ণচন্দ্রের কলায় তাজমহল কীভাবে নিজেকে বিকাশবতী করে তার অন্তর্গত সৌন্দর্যের আভায় সে কথাও বলছিলেন তিনি। পাশে যমুনা, ভেতরে চিরনিদ্রানিরত কিন্তু অনন্ত প্রেমজাগ্রত মমতাজ-শাহ্‌জাহান। আমরা এর স্থাপত্যশৈলীতেও লক্ষ্য করি ভারতীয় মিশ্র ধর্ম-সংস্কৃতির ছাপ আর এর আশাপাশ জুড়ে সারাবিশ্বের জাতি-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষ মানুষের আনাগোনা দেখে ভাবি– প্রেমের একটি স্মারক যদি এভাবে মানুষকে এক করতে পারে তবে কেন পৃথিবীতে পবিত্র প্রেমের নামে কেন

দূর হয় না হিংসা-দ্বেষ-কলুষ? ফিরে যেতে যেতে অনিবার্যত রবীন্দ্রনাথের 'শাহ্‌জাহান' কবিতার অমোঘ পঙ্‌ক্তিটিই মনে গেঁথে যাচ্ছিল বারংবার, 'তাজমহল... কালের কপোলতলে একবিন্দু অশ্রুজল... শুভ্র সমুজ্জ্বল।' তাজমহলের সঙ্গে আগ্রা সফরে আমাদের বাড়তি পাওনা আগ্রা ফোর্ট দর্শন। খাসমহল, আমমহল, রওশনমহল, জাহানারামহল আর শাহ্‌জাহানের বন্দিমহল– সব মিলেঝুলে আমাদের মনের মহলে যেন গোটা মোঘল ইতিহাস হতে লাগল মধুর মর্মরিত। গাইড বর্ণনা করছিলেন প্রেমিক শাহ্‌জাহান বাদশাহ্‌র করুণ পরিণতি, বন্দিদশা, ইতিহাসের ট্র্যাজেডি ইত্যাদি আর আমার মনে ঝাপটা দিয়ে কেবল কবিতা আসছিল– হ্যাঁ মনে পড়ল, কৈশোরে পড়া

কবিতা 'জাহানারার দুঃস্বপ্ন'। কিন্তু মানুষের স্বপ্নের তো কোন শেষ নেই তাই আমরা আবারও এখানে আসার স্বপ্ন ফিরে চলি দূর দিল্লির পানে।

৭ ডিসেম্বর আমাদের অপেক্ষায় কুতুবমিনার; তার আগে প্রবাসী ভারতীয় কেন্দ্র ভ্রমণ। বহির্বিশ্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরার এক অনন্য প্রয়াস। যেখানে মহাত্মা গান্ধীর দাঙ্গাবিরোধী শান্তিযাত্রার স্মারকসহ অনেক আগ্রহোদ্দীপক বিষয় চোখে পড়ল। কুতুবমিনার স্তম্ভগত উচ্চতায় শুধু বিশিষ্ট না, এর পার্শ্ববর্তী এলাকা জুড়ে ছড়ানো-ছিটানো ইতিহাসের বিস্তারও আমাদের মনের প্রসারতা বাড়িয়ে চলে বহুগুণ। আমাদের বন্ধু প্রতীক সূর্যঘড়ির সন্ধানে যেমন ব্যয় করল বহু সময় তেমনি তারিক মোর্শেদ তন্ময়, মনিরা বেগম মনি আর আমি কুতুবমিনারের বিভিন্ন দিকের ছবি তুলতে তুলতে স্বগতোক্তি করছিলাম 'এত সৌন্দর্য ক্যামেরায় ধারণ অসম্ভব প্রায়।' অতঃপর শুভ বিদায়, দিল্লি তোমাকে। পরপর দু'টো ফ্লাইটে আমাদের যাত্রা– অভিমুখ এবার গুজরাটের রাজধানী আহমেদাবাদ।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বিমানবন্দরে অবতরণমাত্রই গান্ধীরাজ্যে আমাদের স্বাগত করতেই যেন স্থানে স্থানে উৎকীর্ণ ছিল অমূল্য সব গান্ধী-সুবচন। একটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল বেশ গড হ্যাজ নো রিলিজিয়ন। সত্যিই তো, মানবমঙ্গলের ঈশ্বর মানবের মাঝে কোন বিভাজনের প্রাচীর খাড়া করতে পারেন না। ৮ ডিসেম্বর সকালটা স্মরণীয় হয়ে থাকল সবরমতী আশ্রমে শিশু-কিশোরদের কলরোলে। গান্ধীজীর একদা অবস্থানস্থলটির সাদামাটা অবয়ব আমাদের নতুন করে শেখাল প্লেইন লিভিং এন্ড হাই থিংকিং-এর সারমর্ম। এই সফরে আসার আগে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক আমাকে বলছিলেন, গান্ধী আশ্রম জাদুঘরের ত্রিদিব সুহৃদের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে পেলাম না তবে শুভেচ্ছাবার্তা পৌঁছে দিলাম। গুজরাট সফরে ঐতিহাসিক স্থাপনার পাশাপাশি সমকালীন ভারতের চকিত দেখা পেলাম ৮ ও ৯ ডিসেম্বর টাটা ন্যানো গাড়ি কারখানা এবং ধীরুভাই আম্বানি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট ভ্রমণসূত্রে। এ দুটি প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তি ও জ্ঞানবান্ধব ভারতের নবযাত্রার যে সংকেত পেয়েছি সে সম্পর্কে পৃথক কোন পরিসরের রচনা দাবি করে। অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল গুজরাট এলজি ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজির মাঠে। বাংলাদেশ-ভারত প্রীতি ফুটবল ম্যাচে আমাদের ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু জয়া চাকমার অনবদ্য অংশগ্রহণ বাংলাদেশের নারী-পুরুষ সমতার অভূতপূর্ব অগ্রগমনকে তুলে ধরল বহির্বিশ্বে। আর সে সন্ধ্যায় আমাদের সম্মানে দু'দেশের সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচিও ছড়াল ভিন্নতার আবেশ। গুজরাটের শিক্ষার্থীরা যেমন তাদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে তুলে ধরল নৃত্য-গীত-কৌতুকের মধ্য দিয়ে তেমনি আমরা বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা কবিতা, মূকাভিনয়, নৃত্য, গান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করলাম আমাদের প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশকে। বাংলা লোকগানের মূর্ছনায় মুহূর্তেই মুখরিত হল সুদূর আহমেদাবাদ। বিদায়বেলায় দু'দেশের তরুণ-তরুণীদের বৃন্দনৃত্য যূথতার প্রত্যাশা ও প্রত্যয় ব্যক্ত করল যেন। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া বাংলাদেশি তরুণ-তরুণীদের সাক্ষাৎলাভ ছিল বিদেশের মাটিতে এক টুকরো বাংলাদেশের পরশ পাওয়া। রাতে আমাদের বাঙালিপনার কথা মাথায় রেখে গুজরাটি স্পেশালের সঙ্গে খাবারের মেন্যুতে আলু ও বেগুনভর্তা যোগ হল। আমরা আহমেদাবাদে বসে যেন পাচ্ছিলাম গ্রামবাংলার অভাবিত খাদ্যস্বাদ।

৯ ডিসেম্বর আদালজ নামে এক ঐতিহাসিক স্থাপনা দেখা হল আমাদের যার বিশেষ উল্লেখ আছে প্রত্নতাত্ত্বিক ভারতের সমৃদ্ধ ইতিহাসে। সেখানে সাক্ষাৎ হল স্থানীয় এক সাংসদের সঙ্গে। গুজরাটে আমাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ হল ডান্ডি কুটিরে গান্ধী জাদুঘরে গিয়ে। তাঁর লবণ সত্যাগ্রহের স্মরণে লবণের ঢিবি আকৃতির উঁচু ভবনে গান্ধীজির জীবনের সংগ্রামী ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে। গাইডের সহায়তা ব্যতীত প্রযুক্তির দিক-নির্দেশে গান্ধীর পটভূমি, জন্ম, বিকাশ, লড়াই, স্বপ্ন– সবকিছুর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এখানে। একটি কক্ষে প্রতীকী ট্রেন রাখা হয়েছে যাতে আরোহণ করলে অনুভবে আসবে বর্ণবিদ্বেষহেতু ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীকে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে লাঞ্ছনার ইতিহাস যার অভিঘাত তাঁর মনে ঔপনিবেশিক ও বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামী সংকল্পের জন্ম দেয়। আমরা ভাবছিলাম আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবনের ওপর ভিত্তি করে তাঁর জন্মভূমি টুঙ্গিপাড়ায় এমন একটি জাদুঘর অনায়াসেই করা যায়।

গুজরাটে আমাদের শেষ সন্ধ্যা কাটল সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত কাহানি-২ চলচ্চিত্র দেখে। বিদ্যা বালান-অর্জুন রামপাল অভিনীত চলচ্চিত্রটির কলকাতার পাশে চন্দননগরে চিত্রায়ন দেখে মনে হচ্ছিল আমাদের ডাকছে পশ্চিমবাংলা, কলকাতা। শেষরাতের বিমানযাত্রার ক্লান্তি নিমিষেই কেটে গেল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে ভারতের যুব মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যখন শুভেচ্ছাপুষ্প উপহার পেলাম। কলকাতায় আগেও এসেছি কয়েকবার, পশ্চিমবঙ্গের লিটল ম্যাগাজিনে লিখে আসছি বহুদিন, কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা গত বইমেলায় নিঝুম মল্লার নামে কবিতার বইও প্রকাশিত হয়েছে আমার। তবু এবারের কলকাতাযাত্রা যেন ছিল একটু অন্যতর। এক যৌথ আনন্দ ও শিক্ষণীয় যাত্রার অংশ আমি এবার। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান ও প্রদর্শশালা দর্শন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ঘুরে দেখায় গেল ১০ ডিসেম্বর আর বিদায়দিবস ১১ ডিসেম্বরে ক্রিকেটের লীলাভূমি ইডেন গার্ডেন, সৌন্দর্যায়িত গঙ্গাতীর প্রিন্সেপঘাট এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ভ্রমণের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল। জোড়াসাঁকোতে যতবার আসা হয় তত যেন নতুন লাগে। জীর্ণ ও পুরাতনের বিরুদ্ধে যে রবীন্দ্রনাথ আজীবন নূতনের আবাহন করেছেন তাঁর শুভজন্ম ও মহাপ্রয়াণের পরশ-লাগা ঠাকুরবাড়ি তো চিরনূতনেরই ডাক দিয়ে চলে। তবে রবীন্দ্রপ্রয়াণ কক্ষের সামনে তাঁর অপারেশন টেবিলের কল্পিত রেপ্লিকা একটি নতুন সংযোজন।

অতঃপর বিদায়ের ডাক শোনা যায়। একজন ফরাসি লেখক বলেছিলেন, 'প্রতিটি বিদায়েই ঘটে খণ্ডমৃত্যু'। আমারও তাই মনে হচ্ছিল। বিদায়মুহূর্তে আটদিনের ভারত ভ্রমণের অলৌকিক আনন্দানুভবের যেন বিলয় ঘটছিল। তবে অন্তর্গত আত্মায় তো বয়ে নিয়ে চলেছি অনশ্বর আনন্দ ও শিক্ষার শিখাপ্রবাহ। মনে পড়ছিল গুজরাটে আমাদের বাসে সে স্থানীয় মানুষটির কথা যার পিতা ভারতীয় মিত্রবাহিনির একজন হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, যিনি লুই আই কানের স্থাপত্যকর্ম বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন দেখতে জীবনে একবার ঢাকায় আসতে আগ্রহী। মনে পড়ছিল তাজমহলের সে গাইডের কথা যিনি কবির অধিক রূপমুগ্ধ বর্ণনা দিচ্ছিলেন মমতাজ-শাহ্‌জাহানের প্রেমমর্মরের। মনে পড়ছিল ভারতের রাষ্ট্রপতি থেকে বিভিন্ন রাজ্যের নানা শ্রেণিপেশার মানুষের আন্তরিক আতিথেয়তার কথা।

আমাদের সকলের অশেষ কৃতজ্ঞতা রইল ভারত সরকার, বাংলাদেশস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের প্রতি। এমন একটি ভ্রমণের সুযোগ দিয়ে তাঁরা যেমন অপার্থিব আনন্দ ও অসামান্য শিক্ষার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছেন তেমনি বাংলাদেশের ১০০জন তরুণ-তরুণীর পরস্পরের মাঝে এক অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের বাতায়ন তৈরি করেছেন। আর সবার শীর্ষে ধন্যবাদ স্বাধীন বাংলাদেশ তোমাকে, তোমার একজন নাগরিক হিসেবেই তো এই সুন্দর ভ্রমণ উপহার পেলাম।

পিয়াস মজিদ কবি

বাংলাদেশের তাল পড়ে ভারতে

আশিস সৈকত

আধাপাকা বাড়িঘর। বাড়ির ঘুমানোর জন্য তৈরি ঘরটি বেশ বড়সড়। তার পাশে রান্নাঘরটি একটু ছোট। দু-ঘরের মাঝে তাল গাছও আছে। আর তাল গাছের গোড়াতে আছে একটি আন্তর্জাতিক পিলার। বাংলাদেশ ভারতের এ সীমান্ত পিলারটি দু-ভাগ করে দিয়েছে বাড়িটিকে। ঘুমানোর ঘরটি বাংলাদেশে আর খাবার ঘরটি ভারতে। বাড়ির উঠোনে থাকা তাল গাছটি একটু বাঁকা। এর গোড়াটি বাংলাদেশে পড়লেও কাণ্ডটি রয়েছে ভারতের সীমানায়। বাংলাদেশের গাছের তাল গিয়ে কুড়াতে হয় ভারত থেকে।

এ ধরনের অসংখ্য অবৈজ্ঞানিক সীমান্তরেখা জটিল করে রেখেছে সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষগুলোকে। মুখ দেখলেই বোঝা যায় জটিলতা খুব একটা টানে না তাদের। মাছ ধরে, শস্য আবাদ করেই মূলত জীবন চলে বাংলাদেশের সাতক্ষীরার সীমান্ত এলাকার মানুষের। একই চিত্র ভারত অংশে পড়া পশ্চিমবঙ্গের হাসনাবাদ এলাকার মানুষের। একই গ্রামে দু-দেশের মানুষ বছরের পর বছর বাস করছেন অনেকটা নির্বিবাদেই। মাঝে মধ্যে দু-দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হলেও তা সাধারণের মধ্যে তেমন প্রভাব ফেলে না। এমনই বলছিলেন ৭৫ বছর বয়সী জাম্মাদ আলী গাজী। নিজের বয়স যখন দশ তখন প্রথম বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে পিলার দেখেছেন তিনি। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বাংলাদেশি এই নাগরিক থাকেন সাতক্ষীরার হড়দহ এলাকায়। যার ওপারেই ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগনার পানিতর এলাকা। কলকাতা থেকে এই এলাকার দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার।

এই সীমান্তের অনেক ঘরই দু-দেশের সীমানার মধ্যে পড়েছে। জাম্মাদ গাজীর বাড়িটি বাংলাদেশে হলেও চিকিৎসার জন্য তাকে যেতে হয় ভারতে। কারণ বাংলাদেশের সীমানার ভেতর হাসপাতালটি একটু দূরে। আর রোগবালাই হলে ভারতের সীমান্তরক্ষীরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন বাংলাদেশিদের জন্য। একইভাবে যে-কোন সমস্যায় ভারতীয় নাগরিকরাও বাংলাদেশের নিরাপত্তারক্ষীদের সহায়তা পান। মাঝে মাঝে কিছুটা সঙ্কট তৈরি করে চোরাচালানি চক্র। তবে দু-দেশের সাধারণ নাগরিকদের খুব একটা সমস্যা নেই। আরো অনেকের মত 'বর্ডার লাইন', 'সীমান্ত পিলার' এসবের ব্যবধান তার কাছে খুব একটা নেই। তবুও দুই দেশ হওয়ার কারণে নিজের ইচ্ছেমত যেতে পারেন না স্বজনদের দেখতে।

সীমান্তে দাঁড়িয়েই কথা হয় তার সঙ্গে

'আমার পাঁচ চেলে পাঁচজনই ইন্ডিয়ায় থাকে। কাজের সুবিধার জন্য তারা ওকিনি থাকে। ৪০ বছর তাদের সঙ্গে দিখা হয় না। আমার বউ চলি গেছে ২০ বছর।' সাতক্ষীরার আঞ্চলিক ভাষায় কথাগুলো বলছিলেন জাম্মাদ গাজী। পাসপোর্ট নিয়ে ভিসা লাগিয়ে ভারত যাওয়ার চেষ্টা করেন না কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি একা থাকি। কে করি দ্যাবে। যদি পারমিট (স্বল্পকালীন ভিসা) থাইকতো তবে ঘুরি আসতাম।'

ভারতের পানিতরের এই সীমান্তে বাংলাদেশ অংশে কথা হয় নাসিমা মণ্ডলের সঙ্গে। শ্বশুরবাড়ি সাতক্ষীরা সদর থেকে হড়দহে বাবার বাড়িতে এসেছেন নাসিমা। বাড়ির ঘরগুলো বাংলাদেশে পড়লেও উঠোনের একটা অংশ ভারতে। নাসিমা বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই এমন দেখি আসতিছি। আমরা বাংলাদেশের লোক। ওপারে (ভারতে) আত্মীয় আছে। বেশিদূর যেতি পারিনে। তবে দুই দেশ মনে হয় না। সবাই তো অনেকদিনির পরিচিত।'

সীমান্ত এলাকার এই অঞ্চলের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দু-দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনি বিজিবি ও বিএসএফ স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে 'বন্ধুত্বপূর্ণ' আচরণ করে। বর্ডার লাইনের গা-ঘেঁষে বাড়ি কিংবা দু-পাড়ে বাড়ির সীমান্ত পড়লেও এই এলাকার লোকজনের কাছে দু-দেশের অস্তিত্ব অনেকটা ওই সীমানা পিলার আর চেকপোস্টের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ভারতের নাগরিক আমারুল্লাহ গাজী বলেন, 'আমার প্রায় সব বন্ধু ওই পলোকার। মাঠে কাজ করতি করতি কথা হয়। আড্ডা মারি। বর্ডারের লাইন দেখি মনে হয় দুটো দেশ। কিন্তু সব তো একই।'

একই কথা বলছিলেন রজব আলী মোল্লা। ভারতের এই নাগরিক

বলেন, 'এক সময় বিয়ে হত দু-পাড়ের মানুষের মধ্যে। এখন আর হয় না। তবে আগের চেয়ে সীমান্ত অনেক শক্ত হয়েছে। এখন দু-তিনদিনের জন্য এদেশ-ওদেশ যাওয়া যায় না। বড়জোর এক দেশের মানুষ অন্য দেশে গিয়ে দাওয়াত খেয়ে আসতে পারেন। স্থানী বিএসএফ বা বিজিবি জওয়ানদের বলেই তারা এসব যোগাযোগ করেন।

স্থানীয় বাংলাদেশি নাগরিক আবদুর রহিম বলেন, 'পাশের গ্রামের এলাকায় ঘুরলে তো আর সমস্যা নেই। বেশিদূর যাইনে। এলাকার লোকজন চলি গিলি পারমিট থাকলি ভাল হত।'

একই এলাকার জাকির আলী গাজীর গোয়াল ঘরের একটা অংশ পড়েছে বাংলাদেশে আর থাকার ঘর ভারতে। তিনি বলেন, 'ছোটবিলাততে এ রকম দেখি। আলাদা দেশ মনে হয় পোস্ট-পিলার দেখলি। ছোটবিলায় খুব যাতাম। একন কম যাই।'

দু-দেশে বাড়ির অংশ পড়ায় সমস্যা হয় কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'নাহ, সমস্যা কিসের। একটুখানি জানি তো। তবে ইকেনের তে (এখান থেকে) পারমিট থাকলি ভাল হইত।' জয়নাল গাজী পেশায় কৃষক। বাড়ি বাংলাদেশে হলেও বর্গা কাজ করেন ভারতীয় মালিকের জমিতে। তিনি এ এলাকা পরিদর্শনরত সাংবাদিককে বলেন, 'কাজ করতি অসুবিধা হয় না, তবে পারমিট থাকলি ভাল হত। দু-চারদিন কাজ করি চলি আসতাম।'

পানিতর বিএসএফ বর্ডার আউট পোস্টের (বিওপি) কোম্পানি কমান্ডার অশোক হালদার বলেন, 'এই এলাকার বর্ডার লাইন যেহেতু জিগজ্যাগ (আঁকাবাঁকা) সেজন্য বিজিবি-বিএসএফ দুই বাহিনিই এখানে মানবিকতাকে প্রাধান্য দেয়। এখানে দুই ফুটের মধ্যে দুটো দেশ। নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা দুই বাহিনি কোন ছাড় দিই না। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে যৌথভাবে আমরা সমস্যার সমাধান করি।'

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনি বিএসএফ-এর ১৪৪ ব্যাটেলিয়ন মোতায়েন রয়েছে এই এলাকায়। স্বল্প সময়ের এই ভিসার বিষয়ে জানতে চাইলে ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার বিক্রম শর্মা বলেন, 'দু-দেশের সরকারি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হলে এটার ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব। বিজিবির সঙ্গে বিএসএফ-এর বর্তমান সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হলে আমরা দুই বাহিনি মিলে এটা তদারকি করতে পারব। আর এটা যদি হয় তাহলে এই সীমান্ত এলাকার উভয় পাশের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে অপরাধীরা বাধ্য করে গুলি করতে। এত কাছ থেকে আক্রমণ করে যে গুলি করা ছাড়া উপায় থাকে না। আত্মরক্ষার্থে গুলি করতেই হয়। তবে আমরা উভয় বাহিনিই চেষ্টা করছি আমাদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিতে, যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে।

'আমরা বিশ্বাস করি এটা শূন্যের কোঠায় আনা যাবে। ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে আমাদের একভাবে কাজ করতে হয়, কারণ ওপার একটি শত্রু দেশ। আর ইস্টার্ন ফ্রন্টে অন্যভাবে কাজ করতে হয়। যেসব ব্যাটেলিয়ন কাজ করছে তাদের বলা হয় যে, এখানে একই কৌশলে কাজ করা যাবে না। কারণ বাংলাদেশ আমাদের অত্যন্ত বন্ধু রাষ্ট্র। এখানে একটু সময় লাগবে। ননলিথাল অস্ত্র ব্যবহার করে এটা এড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

'আমাদের সৈন্যরা খুব কাছ থেকে আক্রমণের শিকার না হলে ফায়ার করে না। আমাদের মন্ত্রণালয় ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের স্পষ্ট নির্দেশনা আছে এবং আমিও দিয়ে থাকি যে-কোন ধরনের হতাহতের ঘটনা যেন না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কিছু ঘটনা ঘটে। আমরা এটা কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি। আমি নিশ্চিত যে, একটা সময় এটা কমে আসবে। একটা সময় এটা শূন্যের কোটায় চলে আসবে। কিন্তু যদি আমার কাছে জানতে চান কবে, সেটা সময় বেঁধে বলা যাবে না। তবে এটা শূন্যের কোটায় চলে আসবে, এটা সম্ভব। অপরাধীরা দা, ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে, তখন বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাতে হয়। আমরা সবসময় বলি গুলি চালিয়ো না। গুলি চালানো লাস্ট স্টেজ।'

ফায়ার বেড়ে গেছে, তাহলে কী অপরাধ বেড়ে গেছে-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা সতর্ক করার জন্য গুলি চালাই।'

আশিস সৈকত
সাংবাদিক, লেখক

রোমাঞ্চকর এক ভারত সফরের অভিজ্ঞতা

রাশেদ মেহেদী

বাংলাদেশের সম্ভবত ৯৫ ভাগ মানুষের বিদেশ যাত্রার শুরুটা হয় ভারত ভ্রমণের মধ্য দিয়ে। আমারও তাই হয়েছিল। সে এক যুগেরও বেশির আগের কথা। যদিও সেবার মুম্বই, পুনে, কলকাতা ঘুরে আসার পর আমার একজন বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় যখন জানলেন আমি ভারতে গিয়েছিলাম, তখন তাঁর একবাক্যে জবাব ছিল, 'তাই বল, তুমি ইন্ডিয়া গেছিলা। আর আমি শুনছিলাম তুমি বিদেশে গেছ।' আসলে ঘর থেকে পা বাড়ালেই ভারতের যে মাটি আমাদের কাছে পরিচিত তাও বাংলার রূপ-রস-গন্ধে ভরা। আমাদের কল্পনায় পুরো ভারতবর্ষই যেন সবুজ, শ্যামল বাংলার প্রতিচ্ছবি। ভারত সফরকে তাই বিদেশ ভ্রমণ মনে হয় না।

আমি নিজেও যতবার ভারত সফরে গেছি, অন্তর থেকে বিদেশ সফর মনে হয়নি। যদিও হাতের পাসপোর্ট মনে করিয়ে দিয়েছে আমি আমার জন্মভূমির বাইরের কোন ভূখণ্ডে যাচ্ছি। সর্বশেষ ভারত সফরে গিয়েছিলাম গেল বছর অক্টোবরে। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে অফিসের অ্যাসাইন্টমেন্টে। পহেলা অক্টোবর থেকে আট দিনের এ সফরে প্রথমবারের মত বিদেশ ভ্রমণের দারুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। এর কারণ অন্য কিছু নয়, দিল্লিতে ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের কার্যালয় সাউথ ব্লক, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন, সেন্ট্রাল রিজার্ভ ব্যাংক, সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড, মুম্বই ফিল্ম সিটি, জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্ট ঘুরে দেখাসহ নতুন কিছু অচেনা অভিজ্ঞতা। আর পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের সবিনয় অভ্যর্থনা এবং আন্তরিক আতিথেয়তাও স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

সফরের শুরুর দিনেই সাউথ ব্লকে আমাদের দেখা হল ভারতের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এম জে আকবেরের সঙ্গে। প্রায় এক ঘণ্টা আমাদের সঙ্গে মত বিনিময় করলেন। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের সার্বিক পরিস্থিতির যে ব্যাখা, বিশ্লেষণ তিনি দিলেন তা সত্যিকার অর্থেই একজন সাংবাদিকের জন্য নতুন চিন্তার খোরাক। আমাদের সব প্রশ্নের জবাবও খুব সাবলীলভাবে দিয়েছেন। এমনকি ভারতীয় নীতির দুর্বল দিকগুলোও তিনি অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন। সাদাসিধে পোশাক, কথায় কিংবা আচরণেরও আভিজাত্যের আতিশয্য নেই, কিন্তু পুরো অবয়বে বিচক্ষণতা এবং প্রাজ্ঞতার ছাপ স্পষ্ট। তাঁকে শুধু একজন মন্ত্রী হিসেবে বিবেচনার সুযোগ নেই, একজন বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষক হিসেবেই আলাপচারিতায় তার পরিচয়টা আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের আরেকজন কর্মকর্তা আমাদের মুগ্ধ করেছেন। তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বিকাশ স্বরূপ। আমি আমার অভিজ্ঞতায় এত সপ্রতিভ এবং উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন কর্মকর্তা আগে দেখিনি। বোঝা যায়, এই কর্মকর্তারা শুধু দাপ্তরিক দায়িত্ব পালন করেন না, এর বাইরে ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি এমনকি সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়েও তাদের চর্চাও একেবারেই ধারাবাহিক। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে জানানোর ফাঁকে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বর্তমান চিত্রটা এক লাইনেই জানিয়ে দিলেন বিকাশ স্বরূপ। তিনি বলেন, আপনারা দেখেছেন স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশ সফর করেছেন। বাংলাদেশের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও গোয়ায় অনুষ্ঠিতব্য ব্রিকস সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে আগামী সপ্তাহেই ভারতে আসছেন। এসব কিছুই তো দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভেতরে বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্কের চিত্র তুলে ধরে।

দিল্লিতে সাউথ ব্লকের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা আলাপ ও মতবিনিময় হয়। ভারতীয় কর্মকর্তাদের মত হচ্ছে, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকলে বাংলাদেশের সঙ্গে উন্নয়ন ও অগ্রগতির সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়া স্বচ্ছন্দ হয়। কারণ আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির প্রগতিশীল দর্শনের মিল রয়েছে। যে কারণে দ্বিপক্ষীয় যে কোন আলোচনায় ঐকমত্যে পৌঁছনো সম্ভব হয়। তারা বলেন, বাংলাদেশে যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক, ভারত তার সঙ্গেই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে একইভাবে কাজ করেছে, করবেও। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত আছে এবং চিন্তায় প্রতিক্রিয়াশীল এমন কোন পক্ষের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক দলের মোর্চার মাধ্যমে সরকার গঠন হলে অগ্রগতির পথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এগিয়ে নেওয়া স্বাভাবিকভাবেই বাধাগ্রস্ত হয়। আওয়ামী লীগ সরকারে এ ধরনের কোন প্রতিক্রিয়াশীল পক্ষ যুক্ত না থাকায় গত সাত-আট বছরে সত্যিকার

অর্থেই অর্থনীতি, বাণিজ্য এবং উন্নয়ন সম্পর্ক যেমন মসৃণভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে, তেমনি দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা সমস্যারও ঐতিহাসিক সমাধান হয়েছে। তারা আরও বলেন, সামনের দিনগুলোতে দক্ষিণ এশিয়ায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আঞ্চলিক সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ের নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ ও ভারত।

সফরে স্মরণীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে আর একটা ছিল ভারতের শীর্ষস্থানীয় নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন বা ওআরএফ কার্যালয়ে কাটানো তিন ঘণ্টা। ভারতীয় কূটনীতির নানা প্রসঙ্গ নিয়ে এখানে কথা হল ঢাকায় নিযুক্ত সাবেক ভারতের হাই কমিশনার পিনাকরঞ্জন চক্রবর্তীসহ কয়েকজন গবেষকের সঙ্গে। পিনাকরঞ্জন চক্রবর্তী উপমহাদেশে আঞ্চলিক সম্পর্ক এবং উন্নয়ন ও অর্থনীতির নতুন সহযোগিতার সম্পর্কের মেরুকরণ যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, প্রায় ত্রিশ বছরের ইতিহাসে সার্ককে এগিয়ে নেওয়ার সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করেছে পাকিস্তান। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলো যখন অর্থনীতি ও উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চেয়েছে পাকিস্তান তখনই বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সার্ক রেল যোগাযোগ চুক্তি, আফগানিস্তানে পণ্য পরিবহনে ট্রানজিট সুবিধা প্রধান, বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধি, সন্ত্রাসবাদ দমন কোন ক্ষেত্রেই অগ্রগতি হয়নি শুধুমাত্র পাকিস্তানের নেতিবাচক মনোভাবের কারণে। এটা দক্ষিণ এশিয়া শুধু নয়, আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রেও সবাই বার বার দেখেছে। বিশেষ করে সেনাবাহিনি নিয়ন্ত্রিত পাকিস্তানে গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অনুপস্থিতি বরাবরই আঞ্চলিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পাকিস্তানকে পিছিয়ে রেখেছে। একটি দেশের একগুঁয়েমির কারণে সার্ক এত বছরেও অকার্যকরই থেকেছে। কিন্তু এখন সময়ের দাবি হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সম্পর্ককে নতুন মাত্রায় এগিয়ে নেওয়া। এক্ষেত্রে একটি জোট অকার্যকর হলে অন্য জোট গঠনের কথা ভাবতেই হবে। সেই জোটটি এখনই প্রস্তুত রয়েছে। সেটা হচ্ছে বিমস্টেক।

তিনি যুক্তি এবং বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে ব্যাপারটা আরও সহজ করে বললেন। মালদ্বীপ এবং আফগানিস্তানকে বিমস্টেকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ রয়েছে। প্রথমে পর্যবেক্ষক হিসেবে নেওয়া যায়। পরে তারা সদস্য হতে পারে। এ দু'টি দেশ অন্তর্ভুক্ত হলে পাকিস্তান বাদে সার্কের অন্য সব সদস্য রাষ্ট্রই বিমস্টেকে চলে আসে। এর ফলে সার্কের বিকল্প হিসেবে অর্থনীতি, বাণিজ্য, উন্নয়ন, নিরাপত্তা সব ক্ষেত্রেই কার্যকর জোট হিসেবে দাঁড়াতে পারে বিমস্টেক। তিনি আরও বললেন, ভারত বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে তেল রপ্তানি করে থাকে। এ অঞ্চলের মধ্যে অভিন্ন পাইপলাইন তৈরির মাধ্যমে 'পাইপলাইন' কূটনীতি জ্বালানি সহযোগিতার ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। এরই মধ্যে ভারতের নুমনিগড় থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর পর্যন্ত নতুন পাইপ লাইন স্থাপনের পরিকল্পনাও হয়েছে।

সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য *ডেইলি সান*-এর সম্পাদক জামিলুর রহমান, জামিল ভাই। এই সফরে তার প্রতিভার অসাধারণ একটি দিক উন্মোচিত হল। তিনি কৌতুক বলায় ওস্তাদ। দিল্লি থেকে শুরু করে আগ্রা, মুম্বই পুরোটাই মাতিয়ে রেখেছেন তিনি। আগ্রায় তাজমহল দেখার সুখানুভূতিকে অনেকটা দুঃসহ করে তুলেছিল প্রায় ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। আর প্রচণ্ড গরমের কষ্টও বার বার ভুলে গেছি জামিল ভাইয়ের দম ফাটানো হাসির কৌতুকের কারণে। সাংবাদিক রাহুল রাহাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। সাংবাদিকতায় স্বমহিমায় উজ্জ্বল তিনি। সফরে রাহুলদার সংগীত প্রতিভা সত্যিই মুগ্ধ করেছে। মনেই হয়েছে দাদা সাংবাদিকতা না করে যদি গান করতেন তাহলেও এতদিনে খ্যাতিমান শিল্পীদের সারিতেই তাঁকে দেখা যেত। বিশেষ করে আগ্রা থেকে দিল্লি ফেরার পথে লম্বা সময় দাদা মাতিয়ে রেখেছেন গানে গানে।

পুরো সফরে আরেকজন মানুষ আমাদের মনে ঠাঁই করে নিয়েছেন। তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরের পাবলিসিটি অফিসার রাজেন্দ্রকুমার শর্মা। পুরো সময়টা তাঁর আতিথেয়তা এবং সহযোগিতার কথা সব সময় মনে থাকবে। সফরে যাওয়ার আগে ভারতীয় হাই কমিশনের প্রিয় রঞ্জনদা বলেছিলেন, অন্যরকম অভিজ্ঞতা হবে। সত্যিই সফরটা ছিল অন্যরকম রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার।

রাশেদ মেহেদী সাংবাদিক ও লেখক

তাজমহলের অভ্যন্তরভাগ ॥ পেছনে ভারতের প্রবেশদ্বার মুম্বইয়ের দৃশ্যপট
মুম্বই সমুদ্রসৈকত ॥ জওহরলাল নেহরু পোর্ট ট্রাস্ট

ছোটগল্প

একটি কল্পকাহিনি

ঋতা বসু

আকাশ ফ্লাইওভারের এমার্জেন্সি রুট দিয়ে একটিই গাড়ি ছুটে চলেছে। নীচে আরও একটি রুটের অজস্র গাড়ি ট্রেন এয়ারবাসের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে অজপা ভাবল এমার্জেন্সি রুট না নিলে মিছিমিছি আরও খানিকটা দেরি হত। তার পদমর্যাদা অনুযায়ী সে সবসময়েই এই স্পেশাল রুট ব্যবহার করতে পারে। কেউ কিছুই বলবে না। কিন্তু অজপারা পুরনো পৃথিবীর সে সব পচাগলা নিয়ম কবেই ত্যাগ করেছে। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে অজপার সুযোগ সুবিধে ব্যবহার করা নিয়ে একমুহূর্তও চিন্তা করার কথা নয়। তবু সে ভাবে। একদম আদিম মানুষের সমাজে গণতন্ত্রের যে চেহারা ছিল আজকের নারীপ্রধান সমাজে তারা সেটা যতটা সম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করছে। গোষ্ঠীর সকল মানুষ একমত হয়ে তাকে দায়িত্ব পালনের যোগ্য বলে মনে করেছে। সেই কাজটি করছে বলেই বাড়তি অধিকার দাবির বর্বরতা তারা অনেক পেছনে ফেলে এসেছে।

গবেষণাগারে ঢোকার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত পোশাক গায়ে গলিয়ে অজপা ভেতরে ঢোকে। তাকে দেখে কেউ কাজ থামায় না। কেউ উঠে দাঁড়ায় না। নিজের কাজটি এক মনে করে যাওয়াই সবথেকে বড় সম্মান প্রদর্শন আজকের সমাজে। অজপা ডিসপ্লে বোর্ডে গবেষণার অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে নীল রঙের একটি বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

শুধু এই গবেষণাগারে আসার সময় তার রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভেতরের উত্তেজনার জন্য সামান্য অপেক্ষাতেই অধৈর্য হয় বলে এই সময় সে নিয়ম ভেঙে তার পদের গুরুত্বকে কাজে লাগায়। এমার্জেন্সি রুটের উচ্চতার জন্যই চোখে পড়ল ল্যাবের দুই রক্ষী রমজা আর কিঙ্গিনী বেগুনি পাতা অর্কিডের ঝাড়ের আড়ালে দু'জনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। লেজার গানগুলো পাশে রাখা। পোশাক আলগা। বিরতির সময় সবাই খোলামেলাভাবেই যা খুশি করে থাকে। কোনও আচরণই অন্যায় নয় গোপনীয়তা ছাড়া। ডিউটি আওয়ার্সের মধ্যে বলেই এদের আড়াল খুঁজতে হয়েছে। এটা অন্যায়। অজপা এদের ঘনিষ্ঠতার কথা জানে। সেই জন্যই একসঙ্গে ডিউটি দেওয়া হয়েছে। যাতে তারা দু'জন একসঙ্গে তাদের দত্তক নেওয়া বাচ্চাটির সঙ্গে ঘরোয়াভাবে সময় কাটাতে পারে। কমিউনিটি হলের থেকে পারিবারিক কাঠামোর অন্তরঙ্গতার স্বাদ যাতে পায় সেই জন্যই এই ব্যবস্থা।

অজপার প্রশ্রয়ের গণ্ডির মধ্যে এরাও আছে। তবু আজ সে একটু বিরক্ত হল। যদিও সারা পৃথিবী প্রায় অপরাধশূন্য, চুরি ডাকাতি, ধর্ষণ নাশকতা কিছুই নেই তবু এই রকম ল্যাবের দরজার পাহারার ভার যাদের হাতে তাদের সদা সতর্ক থাকতে হবে বইকি।

অজপার মধ্যমার আংটি আলোকিত হয়ে উঠল। কয়েকটা বিন্দুর মধ্যে এদের ডিউটি আলাদা করবার নির্দেশ দেওয়া হলে পর আংটি আবার অন্ধকার হয়ে গেল।

গবেষণাগারে ঢোকার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত পোশাক গায়ে গলিয়ে অজপা ভেতরে ঢোকে। তাকে দেখে কেউ কাজ থামায় না। কেউ উঠে দাঁড়ায় না। নিজের কাজটি এক মনে করে যাওয়াই সবথেকে বড় সম্মান প্রদর্শন আজকের সমাজে। অজপা ডিসপ্লে বোর্ডে গবেষণার অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে নীল রঙের একটি বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। প্রতি বারই এই ঘরটায় ঢুকবার সময় তার বুকের ভিতর ধুকপুক এক সেকেন্ডের জন্য হলেও একটু এলোমেলো হয়ে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে অজপা দরজার স্ক্যানারে চোখ রেখে তার অস্তিত্ব জানান দিয়ে গোল পেতলের মুঠিটা স্পর্শ করে। ছোঁয়ামাত্রই দরজাটা নিঃশব্দে পাশে সরে গেল। ঘরের মধ্যে মাত্র একজন পুরুষ বৈজ্ঞানিক একমনে টেস্ট টিউব নিয়ে কাজ করছে আর ডিজিটাল বোর্ডে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে সে সবের ফলাফল লিখে রাখছে।

অজপা সোজাসুজি কাজের কথায়– আর কত দূর?

– হয়ে এল বলে।

পনেরো বছর হয়ে গেল। সারা পৃথিবী চেষ্টা করছে। আমরা প্রথম হবার সম্মানটা পাব তো?

পাওয়া উচিত। এক্স, ওয়াই ক্রোমোজোমের আদ্যোপান্ত চষে ফেলেছি। আলাদা করে জিনগুলোর নাড়িনক্ষত্রও বোঝা হয়ে গিয়েছে। তবু প্রাণের রহস্য নিয়ে ধন্দ লাগে এক এক সময়ে।

– শিগগিরি ধন্দ দূর কর। আর কেউ করার আগে আমরাই করব লড়ব জিতব রে!

– ভারতবর্ষকে ঠেকাতে পারে এমন শক্তি কোথায়? সৃষ্টির উল্টোপথে হেঁটে কেউ যদি সাফল্য পায় তো তোমরাই পাবে।

– ধন্যবাদ। জিনবিজ্ঞান নিয়ে তোমার দক্ষতা প্রশ্নাতীত। সেই জন্য বর্মার জঙ্গল তোলপাড় করে তোমাকে ধরে এনেছি। আমাদের স্ত্রীশিক্ষা টিম অনেক চেষ্টা করেও সফল হয়নি। এখন তোমার হাতযশ।

দাড়ি গোঁফ উলুঝুলু চুল নাড়িয়ে ইরক মিটিমিটি হাসতে লাগল। অজপা বিরক্তি চেপে বলল, এটা হাসির কথা নয় ইরক। অত্যন্ত সিরিয়াস ব্যাপার।

– মহারানি আমি তোমার প্রজা। যদি বারণ কর, তবে হাসিব না।

একমাত্র ইরকই পারে অজপার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে। অজপা ঠিক করেছিল ইরক যতই ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করুক না কেন আজ সে কিছুতেই উত্তেজিত হবে না। তর্ক করবে না। কিন্তু শেষ কথাটা শুনে আর স্থির থাকতে পারল না– সে হত তোমাদের রাজত্বে। মেয়েদের এটা বারণ! ওটা বারণ! আমরা সে সব করি না। এখানে সবাই রাজা, সবাই রানি। সবাই সমান।

– সবে একশো বছর হয়েছে তোমরা পৃথিবী শাসন করছ। আরও কিছুদিন যেতে দাও, ক্ষমতার মদে তোমরাও মত্ত হবে না এমন গ্যারান্টি কোথায়?

– তখন হয়তো তোমরা আবার মাথা তুলবে। যেমনভাবে তোমাদের পচন ধরেছিল বলে আমরা ক্ষমতায় এসেছি।

ইরক সন্ধির হাত বাড়িয়ে বলল, আমরা কেন এত ঝগড়া করি বল তো অথচ একেবারে শুরুতে আদিম সমাজে আমরা তো সমানই ছিলাম।

– সেটা মাত্র ক'দিনের জন্য। ওঠানামার খেলাটা বরং ছিল ওই প্রথম দিকেই তোমরা পুরোপুরি কবজা করার আগে।

ইরক প্রতিবাদের সুরে বলতে শুরু করেছিল আমার মনে হয় তখনই আমরা–

অজপা তাকে এক ঝাপটায় থামিয়ে দিয়ে বলল, তোমরা দূরদূরান্তে চলে যেতে শিকারের খোঁজে। কচি বাচ্চা ফেলে মেয়েদের পক্ষে তা সম্ভবই ছিল না। তারা আগের মতই ঘরের পাশে খাবার খুঁজে বেড়াত। ফলমূল জোগাড় করার চেষ্টা করত। ক্রমশ তারা বুনো ফল বীজ এসব জানতে চিনতে শিখল। দেখল কোথাও কোথাও জমির ওপর বীজ পড়লে অঙ্কুর বেরোয়। তার থেকে গাছ হয়। কী অপূর্ব আবিষ্কার।

– তখন তারা পাথর দিয়ে অল্প অল্প মাটি খুঁজে ঘরের আশেপাশেই ফসল ফলাবার চেষ্টা করত।

– দেখ, তোমার বলার মধ্যেও কেমন তাচ্ছিল্য। তারা যেন শুধু চেষ্টাই করেছে। ফসল কি ফলেনি সেই সময়ে? তোমরা যেন দয়া করে আবিষ্কারের কৃতিত্বটা মেয়েদের দিয়ে ক'দিনের জন্য লাগামটা ধরতে দিয়েছিলে।

ইরক মুচকি হেসে বলে, তুমিই বল না ওই স্টেজের চাষবাস কি নিতান্তই ছেলেমানুষি ছিল না? এক হাত জমিতে পাথর দিয়ে মাটি খোঁড়া আর হাল লাঙলের চাষের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক হল কিনা?

অজপা তেতো গলায় বলল, হাল লাঙল বলদ এল। গায়ের জোরের দরকার হল। ছোট উঠোন থেকে সে ছড়াল বড় মাঠে। সভ্যতার চাকা হু হু করে ছুটে চলল। আবিষ্কার করেছিল মেয়েরাই। কিন্তু তারা পিছু হটল বরাবরের মত।

ইরকের ভঙ্গিতে গোঁয়ারতুমির হালকা আভাস লক্ষ্য করে অজপা বলল, এটা তো মানবে কৃষিকাজই মানুষের ইতিহাসে সবথেকে বিরাট বিস্ময়কর আবিষ্কার। বাকি সবকিছুই এসেছে একের পর এক তার হাত ধরে। তাহলে সভ্যতার ভিত গড়তে প্রথম ইটটা কে গাঁথল? পুরুষ না মেয়ে? কার অবদান বেশি? হাজার হাজার বছর ধরে মেয়েরাও ভুলে ছিল সে কথা। সেই জন্য যে সমাজটা তোমরা গড়ে তুলেছিলে সেখানে মেয়েরা খাটো, নিচু, দুর্বল অসহায়।

– পুরুষ কি আপদে-বিপদে কখনও রক্ষা করেনি মেয়েদের? এই যে

এশিয়া ইউরোপ আমেরিকা জুড়ে স্ত্রী শক্তি দাপিয়ে শাসন করছে। কিন্তু কোথাও কোথাও পুরুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছোট ছোট গোষ্ঠী রয়ে গিয়েছে যারা পুরুষের সমান অধিকারের পক্ষে। চুক্তির বদলে বিয়ের পক্ষপাতী। ইরকের শাশুড়ি আছে এই দলেই। বিয়ের কুফল সত্ত্বেও এরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানের এত বিরাট উন্নতি, মানুষের মসৃণ জীবন এতে গত কয়েক হাজার বছর ধরে পুরুষের কঠিন শ্রম কি মিশে নেই?

অজপার চোখে আগুন জ্বলে ওঠে। মসৃণ জীবনের কথা তোমাদের মুখে মানায় না ইরক। সেই কোন যুগ থেকে মানুষের ইতিহাস দেখ– যুদ্ধ বিগ্রহ, সন্ত্রাস দমন হানাহানিতে ভরা। কারা করেছে এসব? একটা যে কোনও যুদ্ধের নাম বল যেটা মেয়েরা চেয়েছে বলে হয়েছে। পারবে না।

এবার ইরকও অল্প উত্তেজিত– মেয়েরা কখনও ক্ষমতার অপব্যবহার করেনি, কখনও দুর্নীতির জালে ফাঁসেনি বলছ?

অজপা একটু চিন্তা করে বলল, একুশ থেকে তেইশ শতকের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষেই এইরকম কয়েকজন ক্ষমতাশালী মেয়ের কথা আর্কাইভে রাখা রেকর্ডে দেখেছি। তারা নির্লজ্জভাবে প্রচুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি করেছিল। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য নানা দুর্নীতিরও আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু পুরুষদের তুলনায় এই সংখ্যাটা নগণ্য। কোনও তুলনাই হয় না।

ইরকের মুখ থেকে মজার ভাবটা মুছে গিয়েছে বেশ খানিকক্ষণ। সে গম্ভীরভাবে বলল, তুমি মেয়েদের যতটা পবিত্র, নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইছ তারা যে ততটা নয় সেটা আমার থেকে ভাল আর কেউ জানে না। কেন আমি বাড়িঘর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়েছিলাম তা আর কেউ না জানুক তুমি তো জানো।

– ক্ষমতা মানেই খানিকটা অপচয় ও অপপ্রয়োগ এ কথা তো তোমরা আমাদের থেকে ভাল জানো। তোমার স্ত্রী তোমার গবেষণা পড়াশুনা সব বন্ধ করে তোমাকে পারিবারিক আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায়ে লাগিয়েছিল শুনেছি। তোমার প্রতিক্রিয়াটাও একটু বাড়াবাড়ি। ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে নিজের কাজটুকুও করতে পারতে। একসঙ্গে পাঁচটা কাজ, যাকে বলে মাল্টিটাস্কিং, এটা যদি রপ্ত করতে পারতে মেয়েদের মত তা হলে তোমার এমন দুর্দশা হত না।

হিরক বিড়বিড় করে নিজের মনে– আমি তর্ক করতে চাই না। কিন্তু অন্যায়ের বদলা নিতে গিয়ে তোমরাও তো সেই একই কাজ করছ। গর্ভেই পুরুষ ভ্রূণ নষ্ট করছ। পুরুষের উচ্চশিক্ষা বন্ধ। পূজাপাঠের অধিকারও কেড়ে নিয়েছ। সে এখন শুধু মুখ বুজে হুকুম তামিল করে। গোটা জাতটাই মূঢ় ম্লান হয়ে গিয়েছে।

কথাগুলো অজপার দিকে আগুনের হলকার মত ছুটে এল– আসলে ওই জাতটার ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরেছিল অনেকদিন আগেই। মেয়েরা একটা অভ্যেসের মত তাদের তাঁবেদারি করছিল। শুধু গায়ের জোরে কতদিন চলে? পা দিয়ে চেপে কি ভূমিকম্প আটকানো যায়? দেখ বাহুবলের দরকার নেই আজকের পৃথিবীতে। সে কাজ রোবটরাই করছে। আর চিন্তা ভাবনা, বিজ্ঞান, ললিতকলা সমস্ত দিকে মেয়েরা এতটাই উন্নত যে পুরুষরা কোনওদিন তার সমকক্ষ হতে পারবে না।

– সুযোগ না পেয়ে কত সম্ভাবনাময় পুরুষ হারিয়ে যাচ্ছে তার খোঁজ রাখ?

– তুমি সুযোগ পেলে কী করে? বরং আজকের সমাজ অনেক বেশি নিরপেক্ষ ও সাম্যে বিশ্বাসী। ঠিকঠাক গুণের কদরও করে। তবে তোমাদের ভাল না লাগলেও সমাজের সবার মঙ্গলের কথা ভেবে কিছু কিছু ব্যবস্থা নিতেই হয়।

– যেমন সান্ধ্য আইন?

অজপার হাতের ঘড়ির স্ক্রিনে পর পর নানা চিহ্ন ফুটে ওঠে। কবজিটা মুখের কাছে তুলে অজপা তার গত দু'বছরের সঙ্গী আরট্টাকে ল্যাবের কাছে গাড়ি নিয়ে আসতে বলল। ইরকের সঙ্গে তর্ক করে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। হলই বা মুখ্য বৈজ্ঞানিক, অজপা তাকে প্রশ্রয় দিতে চাইল না। ইরককে অগ্রাহ্য করে সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।

ল্যাবের প্রধান পরিচালক সর্যনা ইলেকট্রনিক ফাইল হাতে দাঁড়িয়েছিল। পর পর যা হবে একটা লেজার রশ্মি দিয়ে হাইলাইট করে দেখিয়ে দিল। অজপা বলল– আজ দেরি হয়ে গিয়েছে। ত্র্যম্বকার সঙ্গে পরে একদিন দেখা করব। আদরযত্ন করছ তো ঠিক করে?

– না করলে সে ছাড়বে নাকি? খুব অভিমানী। তোমার মত শক্ত ধাতের নয়।

অজপা হাসল– কেমন আছে সে? ভয়টয় পাচ্ছে না তো?

– একদম না। বরং এত বড় একটা এক্সপেরিমেন্টের পার্ট হতে পেরে সে খুবই গর্বিত। উত্তেজিত।

অকারণেই গলা এক ধাপ নামিয়ে অজপা জিজ্ঞেস করল– কী মনে হয়, সব ঠিকঠাক হবে তো?

ইঁদুর থেকে শুরু করে ঘোড়া পর্যন্ত সাকসেস রেট দেখে তাই তো মনে হচ্ছে। ক্ষমতার সর্বোচ্চ চূড়ায় থাকা দুই মেয়ে তাকিয়ে রইল সোজাসুজি। কাজলহীন চোখে চোখে কত কী যে কথা হল। ক্ষমতার আর এক নাম বিজ্ঞান। একটার পর একটা আবিষ্কার নিরঙ্কুশ করে তুলবে সিংহাসন। বিরোধী কণ্ঠ চাপা দিতে সহায় হবে। সহায় হবে বন্ধুর মত। তবেই না বিজ্ঞানের সার্থকতা। দু'জনেই বোঝে সে কথা। ছাত্রাবস্থা থেকেই তারা জানে পরস্পরকে। সম্পর্ক খানিকটা নিবিড় হবার পাঁচ বছরের জন্য 'লিভ ইন' কন্ট্রাক্টে সই করে একসঙ্গে ছিল। সময়সীমা পার হলে পর আর রিনিউ করেনি। তাই বলে একসঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে কোনও অসুবিধে হয় না। এখন সর্যনার সঙ্গে ত্র্যম্বকার চুক্তিবদ্ধ জীবন। অজপারও সঙ্গী বদল হয়েছে কয়েকবার। পুরনো পৃথিবীতে নাকি এসব নিয়ে জটিলতা হত। আজ শুনলে হাস্যকর মনে হয়।

অজপা গাড়িতে ওঠার আগে সর্যনার হাতে একটু চাপ দিয়ে বলল– প্রতিস্থাপন হয়ে গেলে খবর দিও। বেস্ট অফ লাক।

উত্তরে সর্যনা একটা উড়ন্ত চুম্বন ছুড়ে দিল।

দুই.

এক্সারসাইজ করতে করতে দেয়াল জোড়া পর্দায় ফুটে ওঠা খবরে চোখ রাখছিল অজপা। মনটা সামান্য অস্থির। ত্র্যম্বকার গর্ভে এতক্ষণে প্রতিস্থাপন হয়ে গিয়েছে বিশেষভাবে বানানো ভ্রূণটির। এখনই ছুটে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু স্ক্রিনে ফুটে ওঠা ঘটনাবলীর জন্য সেটা এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না। এশিয়া ইউরোপ আমেরিকা জুড়ে স্ত্রী শক্তি দাপিয়ে শাসন করছে। কিন্তু কোথাও কোথাও পুরুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছোট ছোট গোষ্ঠী রয়ে গিয়েছে যারা পুরুষের সমান অধিকারের পক্ষে। চুক্তির বদলে বিয়ের পক্ষপাতী। ইরকের শাশুড়ি আছে এই দলেই। বিয়ের কুফল সত্ত্বেও এরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে অনেকেই নামকরা গুণীজন। এইসব স্পর্শকাতর মানুষদের খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়। বিশেষ করে শক্তিবাহিনি অতি উৎসাহে যখন বাড়াবাড়ি করে ফেলে তখনই অজপাকে অনেক ভেবেচিন্তে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা তৈরি করতে হয়।

চারশো বছর আগে নির্ভয়ার ঘটনা নিয়ে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে শক্তি বাহিনির সদস্যরা উত্তেজিত থাকে। সুযোগ খোঁজে সেই ঘটনাকে আকাশ নাটিকার মধ্যে জ্যান্ত করে তুলতে। দেশ জুড়ে সন্ধ্যা আইনের কড়াকড়ি সত্ত্বেও নানা ঘটনা ঘটে যায়। ইরক যতই বিরোধিতা করুক না

আত্মজের মধ্যে দিয়ে সে নদীর মত বয়ে যাবে আরও কিছু বছর। আর ত্র্যম্বকা সম্পূর্ণ অচেনা এক আনন্দে নবজাতককে জড়িয়ে ধরল বুকের কাছে। তার রং, লিঙ্গ, চেহারা কোনও কিছুই সে চেয়ে দেখল না। সর্যনার হতাশা, সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানদের ক্ষোভকে অগ্রাহ্য করে দীর্ঘ ন'মাসের অপেক্ষা শেষে প্রসবক্লান্ত ত্র্যম্বকা তার ঘামে ভেজা স্তনবৃন্ত তুলে দিল নবজাতকের মুখে।

কেন পুরুষের নিরাপত্তা সুখ-শান্তির জন্যই এই আইন। যথারীতি কমবুদ্ধির মানুষ বলে তারা সেটা বুঝতে পারছে না। বাইশ-তেইশ শতাব্দীতে ধর্ষণ মেয়েদের উপর অত্যাচার মহামারীর মত হয়ে উঠেছিল। মধ্য এশিয়ায় তো মেয়েদের খুন করলে শাস্তি পর্যন্ত হত না। স্ত্রী শক্তি ক্ষমতায় আসার পর এক এক করে সব বন্ধ করেছে। প্রথমে সন্ধে ছ'টার পর পুরুষদের বাইরে বেরোনো বন্ধ করা হয়েছিল মেয়েদের নিরাপত্তার খাতিরে যাতে তারা নির্ভয়ে যত রাত খুশি বাইরে থাকতে পারে। এমনকী বিবসনা হয়ে ঘুরলেও কারও কিছু বলার নেই। এখন সেই আইনই পুরুষের রক্ষা কবচ। অবশ্য স্ত্রী সঙ্গী থাকলে তারা বাইরে বেরোতেই পারে। সেটা মানে না বলেই প্রতি বছর নির্ভয়া ফেস্টিভ্যালের আগে কোনও না কোনও হতভাগ্য বেওয়ারিশ পুরুষ শক্তিবাহিনির হাতে প্রাণ দেয়। এবার একটি নয়, তিন তিনটি ক্ষতবিক্ষত অঙ্গহীন মৃতদেহ দেখা যাচ্ছে গাছে ঝুলছে। পেশোয়ার, কাবুল, সৌদি আরবে মেয়েদের আনন্দ মিছিল বেরিয়েছে। অনেক জায়গাতেই প্রতীকী পুতুল ফাঁসিতে ঝুলছে। কিন্তু চিন্তার কথা হল সরকারি ওয়েবসাইটে এই বর্বরতার নিন্দে করে যারা বার্তা পাঠাচ্ছে তারা সকলেই নারী।

এই ক্ষোভে মলম লাগাতে এখনই দিল্লি যাওয়া দরকার। সেখানকার শক্তি বাহিনিকে তিরস্কার করতে হবে। বয়স কম রক্ত গরম, এদের একটু ক্ষমার চোখে দেখবার অনুরোধ জানাবে অজপা। তারপর ঝুলির ভেতর থেকে বেড়ালটা বার করবে।

গত একশো বছর ধরে পৃথিবীতে স্ত্রী শক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ। সমশক্তি, সমকামী, সমলিঙ্গের সহাবস্থানে আনন্দধারা বহিছে ভুবনে। পিছিয়ে থাকা, লুকিয়ে থাকা কয়েকটি মানব গোষ্ঠীর মধ্যে অবশ্য এখনও পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ। সেখানে নারী পুরুষ বিয়ে করে পরস্পরের কাছে দাসত্ব স্বীকার করছে। কিন্তু উন্নত নারী সমাজ বহু দিনই বিয়ের শেকল ভেঙে আধুনিক চুক্তির মধ্যে দিয়ে সমাজে সাম্য বজায় রেখে আসছে। পুরুষকে এখন শুধু একটা কাজেই প্রয়োজন, সন্তানার্থে। আপনারা জানেন, ক্লোনিং পদ্ধতিতে গত কয়েক বছর মানুষ সৃষ্টি করার ফলে যে বৈচিত্র্যহীনতা দেখা দিয়েছিল সেটা আমরা কেউই চাইনি। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের সমকামী সমাজ বিকল্পের অভাবে এই অসুবিধেটা এতদিন ধরে মেনে নিয়েছিল। এই তিনটি মৃত্যুর কথা আপনারা ভুলে যান। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা আমাদের দেখতে না হয় তার জন্য আজ আমরা বিরাট এক পদক্ষেপ নিয়েছি। পুরুষ জাতটাই যদি আর না থাকে, ধীরে ধীরে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তা হলে তো আমাদের আর বর্বর হবার সুযোগটাই থাকে না– তাই না? যাদের দেখলে আমাদের ছিন্নভিন্ন করতে ইচ্ছে করে, তাদের মুছে দিলে আমাদের ওই ইচ্ছেগুলোও মরে যাবে এ তো জানা কথা। সেই ব্যবস্থাটাই হয়েছে এত দিনে। পুরুষকে বাদ দিয়ে দু'টি মেয়ের ক্রোমোজোমের থেকে আমরা একটি ভ্রূণ, অবশ্যই সেটি নারীভ্রূণ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি অবশেষে। পুরুষকে আর আমাদের কোনওভাবে প্রয়োজন নেই।

এত বড় সুখবরের কাছে আর সবই তুচ্ছ। যতটুকু বাধা ছিল তা কাটিয়ে আগামী দিনের সমাজ যেসব দিক দিয়ে আরও উন্নত আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে সে বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে আমিও একমত।

বক্তৃতা থেমে যাবার পরও তার রেশ রইল অনেকক্ষণ। ঝড়ের মত হাততালির আওয়াজ ভেসে আসছে তো আসছেই।

আর একশো বছরের মধ্যে সভ্য সমাজ একেবারে পুরুষহীন হয়ে যাবে এর পক্ষে-বিপক্ষে কাগজে টেলিভিশনে তর্ক-বিতর্ক চলতে লাগল। দুর্বল মনের মেয়েরা বলল– একেবারে নিশ্চিহ্ন করার দরকার কী? থাক না ঘরের কোণে যেমন আছে। খুব একটা অসুবিধে তো ঘটাচ্ছে না।

বিপরীত দল বলল– ওরা মিটমিটে শয়তান। সুনামি, পিলিন, হুদহুদ। কখন যে শক্তি সঞ্চয় করে মাথায় চড়ে বসবে কেউ জানে না। আপদ নিকেশ করাই ভাল।

মধ্যমপন্থীরা বলল– আমরা সুন্দরবনের বাঘ, নীল তিমি, ডোডো পাখির জন্য শোক করি আর এ তো মানুষ। বিজ্ঞান যখন এতটা উন্নতি করেছে আর একটু করুক। উপরের চেহারাটা এক রেখে ভেতরটা বদলে দিক।

পৃথিবী জুড়ে তরজা চলতে লাগল। দিনের পর দিন গেল। কার্বন, ক্লোরিন, আয়োডিন ইত্যাদি যাবতীয় মৌলিক পদার্থ ও শুধুই এক্স এক্স ক্রোমোজোম দিয়ে গড়া একটি বিন্দু সিন্ধু হয়ে উঠতে লাগল ত্র্যম্বকার গর্ভে। সারা পৃথিবী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। ঘনিয়ে আসার সর্বনাশের কথা ভেবে পুরুষজাতি আরও জবুথবু। বিভিন্ন জাতির শেষ কয়েকজন পুরুষকে মৃত্যুর পর সংরক্ষণ করা হবে বলে নির্বাচন করা হয়েছে।

বিশেষভাবে নির্মিত এই ভ্রূণটি কতটা স্পর্শকাতর কেউ জানে না। ত্র্যম্বকার পরিবর্তনের প্রতি মুহূর্তের হিসেব রেখে চলছে ল্যাবের অক্লান্ত কর্মীরা। প্রতিস্থাপনের পরের মুহূর্ত থেকেই যন্ত্রের সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই ত্র্যম্বকার। ইরকের কথামত স্বাভাবিক খোলা হাওয়ায় ঘাসজমিতে পা ফেলে ঘুরে বেড়ায় সে। গাছের ফল, নদীর মাছ, চাষ করা শস্যদানা থেকে স্বাভাবিক পুষ্টি নিয়ে বেড়ে উঠছে ত্র্যম্বকার সন্তান। কৃত্রিম ব্যবস্থার প্রবল সমারোহকে এড়িয়ে এই প্রাণ যেন সহজ ব্যবস্থাতেই ভূমিষ্ঠ হয়– ইরক সেটাই চায়। পূর্ণগর্ভ ত্র্যম্বকার দিকে তাকিয়ে তার মন আনন্দে ভরে ওঠে।

ক্রমশ ঘনিয়ে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ওয়াই ক্রোমোজোম যা মানুষকে পুরুষ বানায়, প্রাণ সৃষ্টিতে তার দানকে অগ্রাহ্য করে পরিপূর্ণ স্ত্রী প্রাণের ভূমিষ্ঠ লগ্নে রাষ্ট্রপ্রধানেরা এসে হাজির হয়েছে গবেষণাগারে। একটি স্বচ্ছ কাচের টেবিলের ওপর ব্যথায় কাতর ত্র্যম্বকা। সর্যনা তার হাত ধরে আছে। সে পৃথিবীর প্রথম নারী যে এক সঙ্গে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের স্বাদ পাবে আজ। উদ্বিগ্ন ইরক ঘনঘন ত্র্যম্বকার অবস্থা জরিপ করছে।

শিশুর কান্নার সঙ্গে সবার স্নায়ু টান টান হয়ে উঠল। ত্র্যম্বকার শরীরের খাঁজ থেকে রক্তমাংসের দলাটা খোলা জায়গায় এনে তুলে ধরল ল্যাবের প্রসূতি বিভাগের এক কর্মী। এ কী! এ যে পুরুষ। ল্যাবের হাজার ওয়াটের আলোয় সেই পুরুষ চিহ্ন যেন প্রবল ঠাট্টা হয়ে লেগে আছে শিশু দেহে। সমস্ত পার্থিব ইচ্ছে নিয়ে তারস্বরে সে তার অস্তিত্ব জানান দিল।

অপমান ও শাস্তির ভয়কে তুচ্ছ করে ইরক তাকিয়ে রইল তার উত্তরাধিকারীর দিকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে সে মিশিয়ে দিতে পেরেছিল তার রক্ত ও আত্মার টুকরো। সেই পরীক্ষা সফল হয়েছে। আত্মজের মধ্যে দিয়ে সে নদীর মত বয়ে যাবে আরও কিছু বছর। আর ত্র্যম্বকা সম্পূর্ণ অচেনা এক আনন্দে নবজাতককে জড়িয়ে ধরল বুকের কাছে। তার রং, লিঙ্গ, চেহারা কোনও কিছুই সে চেয়ে দেখল না। সর্যনার হতাশা, সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানদের ক্ষোভকে অগ্রাহ্য করে দীর্ঘ ন'মাসের অপেক্ষা শেষে প্রসবক্লান্ত ত্র্যম্বকা তার ঘামে ভেজা স্তনবৃন্ত তুলে দিল নবজাতকের মুখে। তৃপ্তিতে তার চোখ বুজে এল।

ঋতা বসু
ভারতের কথাশিল্পী

বিজ্ঞান

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু

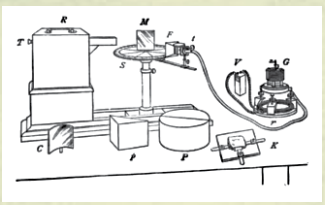

জগদীশচন্দ্রের ক্ষুদ্রতরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণযন্ত্র, ১৮৯৭

বাঙালি পদার্থ, উদ্ভিদ ও জীববিজ্ঞানী এবং প্রথম দিককার কল্পবিজ্ঞান রচয়িতা স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর অসামান্য গবেষণায় উদ্ভিদবিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবহারিক ও গবেষণাধর্মী বিজ্ঞানের সূচনা হয়। ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্স তাঁকে রেডিও বিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করে।

জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি অঞ্চলের ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবারের প্রকৃত বাসস্থান ছিল বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ব্রাহ্ম। তিনি ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। পুত্রের জন্মের পর ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি বর্ধমান ও অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করেন।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, রয়্যাল ইনস্টিটিউট, লন্ডন, ১৮৯৭

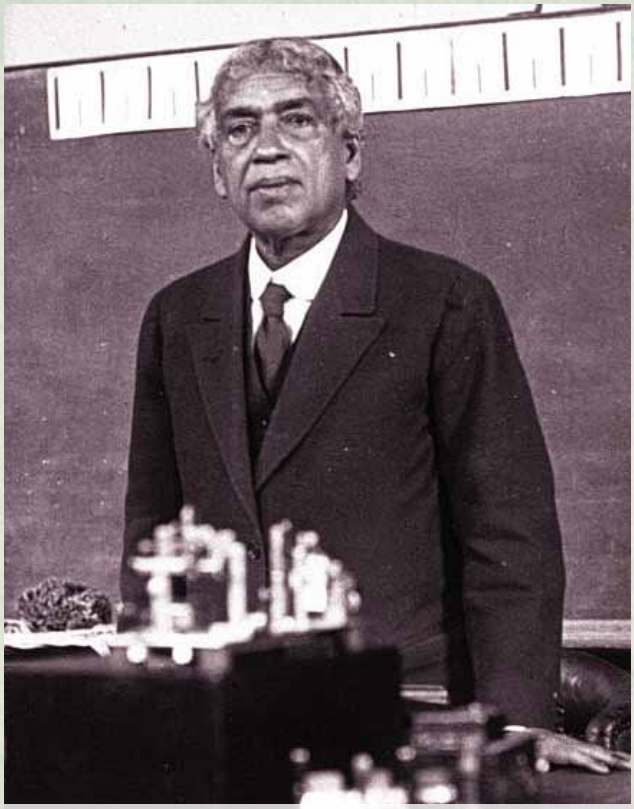

উদ্ভিদের স্নায়ুতন্ত্র বিষয়ে বক্তৃতারত জগদীশচন্দ্র, প্যারিস, ১৯২৬

ইংরেজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও ভগবানচন্দ্র ছেলেকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করাননি। জগদীশচন্দ্রের শিক্ষাজীবন শুরু হয় ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে। বাংলা স্কুলে ভর্তি করার ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব যুক্তি ছিল। তিনি মনে করতেন ইংরেজি শেখার আগে ছেলেমেয়েদের মাতৃ ভাষা আয়ত্ত করা উচিত। বাংলা স্কুলে পড়ার ব্যাপারটি জগদীশচন্দ্রের জীবনে যেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে, তেমনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতেও সাহায্য করেছে। বাংলা ভাষায় তাঁর রচিত বিজ্ঞান প্রবন্ধগুলো এর প্রমাণ। ভাষার প্রতি বিশেষ মমত্ববোধ ছাড়াও ভগবানচন্দ্র চেয়েছিলেন দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে মিলেমিশে তাঁর পুত্র মানুষ হোক, তার মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হোক। উত্তরকালে জগদীশচন্দ্রের জীবনে তাঁর প্রথম বাংলা স্কুলের অধ্যয়নপর্ব গুরুত্বপূর্ণ ছাপ ফেলেছিল।

এরপর জগদীশচন্দ্রকে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। সেখান থেকে পড়াশুনো শেষ করে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। এই কলেজে ইউজিন ল্যাফন্ট নামে একজন খ্রিস্টান যাজক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরপর তিনি আইসিএস পরীক্ষায় বসার জন্য ইংল্যান্ডে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ভগবানচন্দ্র রাজি হননি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পুত্র বিদ্বান হোন।

বাবার ইচ্ছা ও তাঁর আগ্রহে তিনি ১৮৮০ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্যে লন্ডনের উদ্দেশে পাড়ি জমান, কিন্তু অসুস্থতার কারণে বেশিদিন চিকিৎসাবিদ্যায় পড়াশুনো চালিয়ে যেতে পারেননি। তাঁর ভগ্নীপতি আনন্দমোহন বসুর আনুকুল্যে জগদীশচন্দ্র প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। এখান থেকে ট্রাইপস পাশ করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এসসি পাঠ সম্পন্ন করেন। কেমব্রিজে জন উইলিয়াম স্ট্রাট, লর্ড রেলি, মাইকেল ফস্টার, জেমস ডেওয়ার, ফ্রান্সিস ডারউইন, ফ্রান্সিস মেটল্যান্ড বালফুর, সিডনি ভাইনসের মত বিখ্যাত বিজ্ঞানসাধকেরা তাঁর শিক্ষক ছিলেন। তিনি যখন কেমব্রিজে, প্রফুল্লচন্দ্র তখন এডিনবার্গে পড়ছেন। লন্ডনে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হন। পরিচিতি ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে রূপলাভ করে।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জগদীশচন্দ্র ভারতে ফিরে আসেন। ভারতের গভর্নর-জেনারেল জর্জ রবিনসন, প্রথম মার্কুইস অফ রিপন-এর অনুরোধে স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফট্ জগদীশচন্দ্রকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। কলেজের অধ্যক্ষ চার্লস হেনরি টনি এই নিয়োগের বিপক্ষে ছিলেন। তাঁকে গবেষণার কোনরকম সুযোগ দেওয়া হত না, শুধু তাই নয়, তিনি ইউরোপীয় অধ্যাপকদের তুলনায় অর্ধেকেরও কম বেতন পেতেন। এর প্রতিবাদে জগদীশচন্দ্র বেতন নেওয়া বন্ধ করে দেন এবং তিন বছর অবৈতনিকভাবেই অধ্যাপনা চালিয়ে যান। দীর্ঘকাল ধরে এই প্রতিবাদের ফলে তাঁর বেতন ইউরোপীয়দের সমতুল্য করা হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে গবেষণার কোনরকম উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা না থাকায় ২৪ বর্গফুটের একটি ছোট ঘরে তাঁকে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে হত। পদে পদে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁর বিজ্ঞানসাধনার প্রতি আগ্রহ ভগিনী নিবেদিতাকে বিস্মিত করেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদানের এক দশকের মধ্যে তিনি বেতার গবেষণার একজন দিকপালে পরিণত হন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার প্রথম আঠারো মাসে জগদীশচন্দ্র যে সব গবেষণাকাজ সম্পন্ন করেছিলেন তা লন্ডনের রয়েল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। এই গবেষণাপত্রের সূত্র ধরেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৯৬ সালের মে মাসে তাঁকে ডি এসসি ডিগ্রি প্রদান করে। এই গবেষণাগুলোকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে বিচার করতে হবে। প্রতিদিন নিয়মিত ৪ঘণ্টা শিক্ষকতার পর যেটুকু সময় পেতেন, সে-সময়েই তিনি এ গবেষণার কাজ করতেন। তার ওপর প্রেসিডেন্সি কলেজে কোন উন্নতমানের গবেষণাগার ছিল না, অর্থসংকটও ছিল প্রকট। সীমিত ব্যয়ে স্থানীয় মিস্ত্রীদের শিখিয়ে-পড়িয়ে তিনি পরীক্ষণের জন্য উপকরণ প্রস্তুত করতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্রের আঠারো মাসের সেই গবেষণার মধ্যে মুখ্য ছিল অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা। ১৮৯৫ সালে তিনি অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি এবং কোন তার ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তা প্রেরণে সফলতা পান। ১৮৮৭ সালে বিজ্ঞনী হেইনরিখ হার্টজ প্রত্যক্ষভাবে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এ নিয়ে তিনি আরও গবেষণা করছিলেন, কিন্তু শেষ করার আগেই তিনি মারা যান। জগদীশচন্দ্র তাঁর অসমাপ্ত কাজে হাত দিয়ে সর্বপ্রথম প্রায় ৫ মিলিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ তৈরি করেন। এ ধরনের তরঙ্গকেই বলা হয়ে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভ। আধুনিক রাডার, টেলিভিশনএবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই তরঙ্গের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মূলত এর মাধ্যমেই আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বাঙালি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে জগদীশচন্দ্র বসু

আদান-প্রদান ঘটে থাকে।

এর মধ্যে ১৮৮৭ সালে জগদীশচন্দ্র তখনকার দিনের বিখ্যাত নারীবাদী সমাজকর্মী অবলা দাশকে বিয়ে করেন। অবলা ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত সংস্কারক দুর্গামোহন দাশের কন্যা। ইতোপূর্বে অবলা কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে চাইলে তাঁকে ভর্তি হতে দেওয়া হয়নি, কারণ সেখানে তখন মেয়েদের পড়ানো নিষেধ ছিল। ১৮৮২ সালে বঙ্গ সরকারের বৃত্তি নিয়ে অবলা মাদ্রাজে যান পড়াশোনার উদ্দেশে। সেখানে চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন শুরু করলেও অসুস্থতার কারণে আবার ফিরে আসতে বাধ্য হন। বিয়ের সময় জগদীশচন্দ্র আর্থিক অনটনের মধ্যে ছিলেন। এর মধ্যে আবার তিনি তখন কলেজ থেকে বেতন নিতেন না। এছাড়া জগদীশের বাবার কিছু ঋণ ছিল যার কারণে তার পরিবারকে পথে বসতে হয়। যাহোক, অনেক কষ্টে তাঁরা এর মধ্য থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ক্রমে সব ঋণ পরিশোধ করতে সমর্থ হন। ঋণমুক্তির পর কিছুদিন মাত্র জগদীশচন্দ্রের পিতা-মাতা জীবিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের গবেষণাকর্মের সূত্র ধরেই ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন তাঁকে ব্রিটেনে বক্তৃতা করার জন্য ডাকে। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'অন ইলেকট্রিক ওয়েভ্স'। মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে করা পরীক্ষণগুলোর উপর ভিত্তি করেই তিনি বক্তৃতা করেন যা ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চমৎকৃত ও আশ্চর্যান্বিত করে। অশীতিপর বৃদ্ধ বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন বক্তৃতা শোনার পর লাঠিতে ভর দিয়ে এসে জগদীশের স্ত্রী অবলা বসুকে তার স্বামীর সফলতার জন্য অভিবাদন জানান। জগদীশচন্দ্র এবং অবলা দু'জনকেই তিনি তাঁর বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এই বিষয়ের ওপর বিখ্যাত *টাইম্স* সাময়িকীতে একটি রিপোর্ট ছাপা হয় যাতে বলা হয়, 'এ বছর ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্মিলনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্পর্কে অধ্যাপক বসুর বক্তৃতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, কেমব্রিজের এম এ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অফ সাইন্স এই বিজ্ঞানী বিদ্যুৎরশ্মির সমাবর্তন সম্পর্কে যে মৌলিক গবেষণা করেছেন, তার প্রতি ইউরোপীয় বিজ্ঞানী মহলে আগ্রহ জন্মেছে। রয়্যাল সোসাইটি বিদ্যুৎরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয়ের গবেষণাপত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছে।'

পারসন্স ম্যাগাজিন লেখে: 'বিদেশী আক্রমণে ও অন্তর্দ্বন্দ্বে বহু বছর ধরে ভারতে জ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে চলেছিল... প্রবল বাধা-বিপত্তির মধ্যে গবেষণা চালিয়ে একজন ভারতীয় অধ্যাপক আধুনিক বিজ্ঞানের জগতেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজের নজির রেখেছেন। বিদ্যুৎরশ্মি বিষয়ে তাঁর গবেষণাপত্র ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে পঠিত হবার সময় তা ইউরোপীয় জ্ঞানী-গুণীমহলে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তাঁর ধৈর্য ও অসাধারণ শক্তির প্রশংসা করতেই হয়– অন্তত যখন ভাবি যে তিনি মাত্র ১৮ মাসের মধ্যে বিদ্যুতের মত অত্যন্ত দুরূহ বিভাগের ছয়টি উল্লেখযোগ্য গবেষণা শেষ করেছেন।'

লিভারপুলে বক্তৃতার পর তার আরও সাফল্য আসে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে সান্ধ্য বক্তৃতা দেওয়ার নিমন্ত্রণ। এই বক্তৃতাটি আনুষ্ঠানিকভাবে 'ফ্রাইডে ইভনিং ডিসকোর্স' নামে সুপরিচিত ছিল। এই ডিসকোর্সগুলিতে একেবারে প্রথম সারির আবিষ্কারকদের আমন্ত্রণ জানানো হত। সে হিসেবে এটি জগদীশচন্দ্রের জন্য ছিল এক দুর্লভ সম্মান। ১৮৯৮ সালের ১৯ জানুয়ারি দেওয়া তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'অন দ্য পোলারাইজেশন অফ ইলেকট্রিক রেইস' তথা বিদ্যুৎরশ্মির সমাবর্তন।

এই বক্তৃতার সফলতা ছিল সবচেয়ে বেশি। বায়ুতে উপস্থিত বেশ কিছু বিরল গ্যাসের আবিষ্কারক হিসেবে খ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড রেলি তাঁর বক্তৃতা শুনে এবং পরীক্ষাগুলি দেখে এতটাই বিস্মিত হয়েছিলেন তার কাছে সবকিছু অলৌকিক মনে হয়েছিল। তিনি এ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এমন নির্ভুল পরীক্ষা এর আগে কখনও দেখিনি– এ যেন মায়াজাল'। এই বক্তৃতার সূত্র ধরেই বিজ্ঞানী জেমস ডিউয়ার-এর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়। ডিউয়ার গ্যাসের তরলীকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য বিখ্যাত। এই বক্তৃতা সম্বন্ধে 'স্পেক্টেটর' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, 'একজন খাঁটি বাঙালি লন্ডনে সমাগত, চমৎকৃত ইউরোপীয় বিজ্ঞানীমণ্ডলীর সামনে দাঁড়িয়ে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অত্যন্ত দুরূহ বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন– এ দৃশ্য অভিনব।'

ইউরোপীয় বিজ্ঞানীমণ্ডলীর সামনে এই বক্তৃতার পর ফ্রান্স এবং জার্মানি থেকে আমন্ত্রণ আসে এবং তিনি সেখানে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। সবখানেই তাঁর বক্তৃতা বিশেষ প্রশংসিত হয়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক কর্ন তার বন্ধু হয়ে যান এবং তিনি ফ্রান্সের বিখ্যাত বিজ্ঞান সমিতি Société de Physique-এর সদস্য মনোনীত হন। সফল বক্তৃতা শেষে ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসে তিনি সস্ত্রীক দেশে ফিরে আসেন।

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের সফলতার কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া তিনি বিজ্ঞান গবেষণায়ও প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিলেন যার জন্য তার সুখ্যাতি তখনই ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালিরাও বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে নিউটন-আইনস্টাইনের চেয়ে কম নন, তিনি তা প্রমাণ করেন। জগদীশচন্দ্র যে গ্যালিলিও-নিউটনের সমকক্ষ বিজ্ঞানী তার স্বীকৃতি দিয়েছিল লন্ডনের ডেইলি এক্সপ্রেস পত্রিকা, ১৯২৭ সালে। আর আইনস্টাইন তাঁর সম্পর্কে নিজেই বলেছেন: 'জগদীশচন্দ্র যেসব অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন তার যে কোনটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।'

বিশ্বব্যাপী মেধার স্বীকৃতির পাশাপাশি নানা সম্মানে অভিষিক্ত হয়েছেন এই দিকপাল বিজ্ঞানী। ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯২০ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯২৭ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-এর ১৪তম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। '২৮ সালে তিনি ভিয়েনা একাডেমি অফ সায়েন্স-এর সদস্য নির্বাচিত হন। এ ছাড়া তিনি লিগ অফ ন্যাশন্স কমিটি ফর ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন-এর সদস্য মনোনীত হন। তিনি ছিলেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেস অফ ইন্ডিয়া (বর্তমান নাম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমি)-র প্রতিষ্ঠাতা ফেলো।

• সূত্র ইন্টারনেট

ল্যাম্পপোস্ট

সন্তোষ ঢালী

কুয়াশায় ভিজে ভিজে কাঁদছে ল্যাম্পপোস্টের আলো
নিঃসঙ্গ নারীর মত ওরা কাঁদছে রাতভর করুণ শহরে
স্বজন হারানো অজানা কোন্ বেদনায়।
হঠাৎ কেন যেন এই শহর মৃত মনে হয়
মনে হয় বহু আগে কোন একদিন প্রাণহীন হয়ে গেছে
কোন এক মহামারী লেগে, মড়কের রাত ছিল এই শহরে
নিয়ন আলোর নিচে নিজকেও প্রেত বলে মনে হয়
নিজকেও ভয় হয় নিজের– এ কেমন জটিল সময়।

অতীত এসে দৈত্যের মত সামনে দাঁড়ায়
মহাকাল পিছু নেয়, পায়ে পায়ে মৃত্যু বাজায় ঘুঙুর
রাত্রি কাঁদে অচেনা আতঙ্কে
ল্যাম্পপোস্টগুলো ভীত-বিহ্বল রাত্রির চোখ প্রেতের শহরে
আমিও দাঁড়িয়ে থাকি একাকী অসহায় নিঃসঙ্গ ল্যাম্পপোস্ট এই শহরে
এই শহর কারো নয়, দানবের। এই শহর প্রেতের।

মধুবৃষ্টির পর

জগন্ময় মজুমদার

মধুবৃষ্টি ঝরে অনেকদিন পর
তৃষ্ণা মেটে না বেড়ে যায় জ্বর
মধু চাইনি মেঘের মোড়ক
প্রতিশ্রুতি স্তোক
কেবল মেঘের চাষ ফলাক অঝোর...

অতিফলনের দোষ এড়াব চুক্তিতে
মউ স্বাক্ষরে মেঘ-মুক্তিতে
সাহারাকে দিয়ে যাব ধার
চেরাপুঞ্জির মেঘের অপার...

আবার জমেছে মেঘ ঈশানে আবেগ
এসব পুরনো প্রথা এবং সাবেক
দশদিশি ভরে যাক মেঘের ফসলে
রফতানিযোগ্য মেঘ ভাতের বদলে।

জগন্ময় মজুমদার ভারতের কবি

জলের উপরে পুঁটি, তাতে রৌদ্রের ছমছম নাচ

তাপস রায়

দু'চোখের হা-ভাতে যাপন থেকে সরে এসে
একটা মরা নদী তরাইয়ের
চলকে ওঠা সবুজের ভেতরে শীতকাল ডেকে নিয়ে আসে
জামা-কাপড় বদলে যায়, দূরে লেবু ফুল
হাসপাতালহীন এইদিকে আমরা ঝিঁঝিঁপোকার
রাত্রিখানি সাজিয়ে নিই

যা কিছু শেয়ার করি– দলিল-দস্তাবেজের মত ইশারা
জোনাকি ফুরিয়ে ফেলার পর
সেই লোকাল ট্রেনের সংবৎসর, পার্কের বেঞ্চে
রাত্রি নামিয়ে এনে দু-একটা চুমু, বেঁচে থাকা
টের পাচ্ছে না কাকপক্ষী এমন হাট-বাজার–
গৃহগত ক্যালেন্ডার
গত গ্রীষ্মেও তুমি জানো আইসক্রিমঅলা ঘুরে গেছে

আজ জঙ্গলের ভেতর মনে হতে পারে
বিরহ, সেই সোনার হরিণ, আর ছুটে যাওয়া
জানালায় টাঙিয়ে রেখে আমাদের দরজা বন্ধ করা, ভেসে যাওয়া

তাপস রায় ভারতের কবি

বিমূঢ়তা

অনিন্দিতা বসু সান্যাল

ক্লান্ত রাত্রির বুকে
যাযাবর হেঁটে চলে পথ
মোচার ভেলায় হেলে দুলে
কানা বেয়ে ওঠে মনোরথ

মনে হল, শিমুলতলায়
মালিনীর খঞ্জ পায়ের ছাপ
মনে পড়ে প্রক্ষেপে ছড়ানো
হৃদয়ের অতল অভিশাপ

কেন জানি, চক্র রেলপথে
ঘটে যায় ভূমি বিস্ফোরণ
কেন জানি মনুমেন্ট তলে
অন্ধের অবুঝ আচরণ

মনে হল, লাল দিঘিটির
ম্লান ছায়া, লুকোচুরি খেলে
মনে হল, পালকে রক্ত মিশে গেলে
বিমূঢ়তা থাকে পদতলে।

অনিন্দিতা বসু সান্যাল ভারতের কবি

একদিন নদী ভালবাসতে বাসতে

শামসুল আলম

এপ্রোনের গা ছুঁয়ে ঝুলে থাকা স্টেথোস্কোপ, কাঁধের পেছনে
নরম রোম, হাতের ওপর ঝুলতে থাকা ব্যাগ অথচ ছাত্রাবাসের বারান্দায়
ঘড়ির কাঁটার ওপর চোখ রেখে মনে হয়নি
সূর্যটা গলতে গলতে অনেক দূর।

অপলক তাকিয়ে দেখি
তোমার গালের ওপর একটা বড়মাত্রিক তিল মাছির মত বসে আছে।
তোমার নরম হাসিতে হাসপাতাল, এমন কী আমার শয্যার বিছানা হেসে ওঠে,
এখনও মনে হয়
চল্লিশোর্ধ একজন মানুষ তোমাকে ভালবাসে

প্রজাপতির ছুঁয়ে যাওয়া রঙ, চোখের ওপর ভাসতে থাকা স্বপ্ন–
কখনও ডাউনট্রেনের স্লিপারে পা রেখে ছুটে যাচ্ছ বাড়ি
মায়ের মুঠোভাত, গাল হাসিতে লেপটে থাকা মুড়ো, আঁচলে মুছে
দেওয়া মুখ।
তোমার বাবার মুখে হাসি, কখনো পাহাড়পুরের মেঘ
আমার দুইচোখে প্রবাহিত নদী, তোমার বিস্তৃতি বলেই
অবিরাম ভাসতে চাই।

এখনো ঢাকা এলে, এপ্রোনে গা গলিয়ে হাঁটো
আজিমপুর, নিউ মার্কেট, শহীদমিনার, শাহবাগ।

গোশতের দোকানের গা ঘেঁষে হাঁটতে দেখেছি অনেকদিন

শয্যার পাশে শুয়ে থাকা এবড়োথেবড়ো আমার শরীরের
পঞ্চমাংশে আঙুল চালালে, অনেকক্ষণ–
জানো তো, সুড়সুড়ি নেই!

তোমার রিডিংটেবিলে কবিতাগ্রন্থ থাকে না
আমি জানি মুখবন্ধ কবিতায় তোমার গাল,
কপাল ভ্রুর কিয়দংশ অনুভূতির দ্রাঘিমা নেই।

সূর্যের পায়ে হেঁটে বেড়ানো নীরব দুপুর
অথচ প্রগল্‌ভ রাত, নাস্তার টেবিলে আঙুল চালানো রুটির ভাঁজে
ঠোঁটের হাসি গলতে গলতে মিলিয়ে যায়–
একদিন ভালবাসার চাঁদ পূর্ণসৌষ্ঠব জ্যোৎস্না

নাচতে থাকা জলের ওপর হাসতে হাসতে মিলিয়ে যাবে
মেঘের পৃষ্ঠদেশ।

আমি জানি
একদিন নদী ভালবাসতে বাসতে
প্রজাপতির আলোকীর্ণ রঙ তোমার চোখে ছুঁয়ে যেতে যেতে
একদিন জ্যোৎস্নায় তোমার দুইচোখ ভাসতে ভাসতে
ভালবাসবে আমায়
আমি জানি।

মোঘল-বৈভব

দুখু বাঙাল

সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে জল-ঝড় রাতে
ঝড়কে ছাপিয়ে ঠিক উঠেছিল অন্য এক ঝড়
জানি না কীসের ছলে নেভালে হাতের আলো
অতঃপর হাত রাখলে সোনার কঞ্চিতে।

খরতাপে দগ্ধ এক মিসেস চৌধুরী
ছেলেমানুষের সাথে এ ছিল আপনার শুধু
মিনতির অশ্রুকণা– ছেলেমানুষিই।

ভরা জ্যোৎস্নার মুখে ছুড়ে দিলে অন্ধকার
যে আঁধারে ফুটে উঠল গ্লানির বিষণ্ন তারা
ফুটি ফুটি কদমের প্রথম পৌরুষ
এই বুঝি ছিল তার মোঘল-বৈভব।

বহুদিন পরে ফের আত্মঘাতী ঝড়ে
মনে হল মানুষের লক্ষ্মীছাড়া ইচ্ছেগুলো
মাঝে মধ্যে ওরকমই করে।

চাটগাঁর মিসেস চৌধুরী
জলে কি ডাঙায় আপনি জানি না কিছুই
আপনার ইচ্ছেটাকে দূর হতে আজ শুধু
বৌদ্ধ ভিক্ষুর মত জোড়হাতে নমস্কার করি।

স্বপ্নের পাশাপাশি

নীহার মোশারফ

জলের রঙে মহরত হয় শুভ দৃষ্টির
গেরুয়া পিরান
রক্তের কণিকায় ভেসে ওঠে তেজ
যেমন চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করে
শাড়ির আঁচল
প্রতিভার জিয়নকাঠি
মুছে যায় অতল অন্ধকার
নাচে রূপের বাঁক, বিস্ময়কর মাধুর্য
নিসর্গের শব্দ, দূরের সেঁজবাতি
কষ্ট নেই। স্বপ্নের পাশাপাশি থাকি বলে
ফুরফুরে মন
বিচ্ছিন্নতা নেই।
আদিখ্যেতায় লাভ কী?
এখানেই জীবনের হিসাব-নিকাশ
প্রকৃতির কীর্তনে উচ্ছ্বাস হয়ে ওঠা হাওয়া
সে হাওয়ায় মিশে যাই ছায়া সুষমায়...

উদ্‌যাপন

প্রবাসী ভারতীয় দিবস ২০১৭

ভারতের উন্নয়নে বিদেশে বসবাসরত ভারতীয়দের অবদানের কথা স্মরণ রেখে প্রতি বছর ৯ জানুয়ারি প্রবাসী ভারতীয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। ৯ জানুয়ারিকে বেছে নেওয়ার কারণ, ১৯৯৫ সালের এই দিনে মহান প্রবাসী মাহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসেছিলেন এবং ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্বদানে অগ্রণী হয়েছিলেন, যার ফলে ভারতীয়দের জীবন চিরকালের জন্য পরিবর্তিত হয়।

২০০৩ সাল থেকে প্রত্যেক বছর প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই সম্মেলন পারস্পরিক উপকারমূলক কর্মকাণ্ডে সরকার এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁদের পূর্বপুরুষদের ভূখণ্ডের মানুষের যোগাযোগের একটা ত্রিপক্ষীয় মঞ্চ হিসেবে কাজ করে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অনাবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে এ সম্মেলন খুব কার্যকর যোগসূত্র হিসেবেও কাজ করে।

সম্মেলনে ভারতের প্রবৃদ্ধিতে তাদের ভূমিকার প্রশংসা করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জনকারীদের মর্যাদাপূর্ণ 'প্রবাসী ভারতীয় সম্মান' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এ সম্মেলন প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনারও ফোরাম।

২০১৫ সালে সরকার প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনকে ঢেলে সাজানোর এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে নতুনভাবে যোগাযোগ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। ফলে প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন প্রতি দু'বছরে একবার ভারতে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মধ্যবর্তী বছরে ভারতীয় সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে দিল্লিতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর, ফলাফলভিত্তিক প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের মাধ্যমে সরকার সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বিশালসংখ্যক অনাবাসী ভারতীয়র সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ গড়ে তুলতে চায়। প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক সংযোগের জন্য বিষয়ভিত্তিক সংলাপ অনুষ্ঠানের সুযোগ করে দেয়।

প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের ১৪তম সংস্করণ অনুষ্ঠিত হবে ৭-৯ জানুয়ারি ২০১৭ কর্নাটকের বেঙ্গালুরুতে। এবারের থিম হচ্ছে 'প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ।'

প্রবাসী ভারতীয় দিবস ২০১৭-র উদ্দেশ্যাবলি:

- প্রবাসী ভারতীয় দিবস ২০১৭-র থিম 'প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ';
- প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং একে-অপরের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি করা;
- ভারতে প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের উদ্বেগ ও প্রত্যাশার জায়গাগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া;
- তরুণ অনাবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাতে তারা তাদের শিকড় সম্পর্কে আরো বেশি করে জানতে পারে।

এক নজরে মেঘালয়	
দেশ	ভারত
অঞ্চল	পূর্ব ভারত
রাজধানী	শিলং
বৃহত্তম শহর/ বৃহত্তম মহানগর অঞ্চল	শিলং
জেলা	১১টি
প্রতিষ্ঠা	২১ জানুয়ারি ১৯৭২
সরকার	
• শাসকবর্গ	মেঘালয় সরকার
• রাজ্যপাল	ভি. শনমুগনাথন
• মুখ্যমন্ত্রী	মুকুল শর্মা(আইএনসি)
• আইনসভা	এককক্ষবিশিষ্ট (৬০টি আসন)
• হাইকোর্ট	মেঘালয় হাইকোর্ট
আয়তন	
• মোট	২২,৪২৯ বর্গকিমি (৮,৬৬০ বর্গমাইল)
• এলাকার ক্রম	তেইশ
জনসংখ্যা (২০১৪)	
• মোট	৩,২১১,০০০
• ক্রম	তেইশ
• ঘনত্ব	১৪০/বর্গকিমি (৩৭০/বর্গমাইল)
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও ৩১৬৬ কোড	IN-ML
সরকারি ভাষা	ইংরেজি, খাসি, গারো
ওয়েবসাইট	meghalaya.gov.in

ভি শনমুগনাথন

মুকুল শর্মা

রাজ্য পরিচিতি

মেঘালয়

উত্তর-পূর্ব ভারতের এ রাজ্যটির নামের অর্থ মেঘের আলয়। ২০১৪ সালে মেঘালয়ের জনসংখ্যা ছিল ৩২ লাখ ১১ হাজার ৪৭৪। আয়তন ২২ হাজার ৪৩০ বর্গ কিলোমিটার, দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত ৩:১। মেঘালয়ের দক্ষিণে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ, পশ্চিমে বাংলাদেশের রংপুর এবং পুবে ভারতের আসাম রাজ্য। রাজধানী শিলং। ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে একে বলা হত 'প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড'। মেঘালয় আগে আসামের অংশ ছিল, তবে ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি খাসি, গারো ও জৈন্তিয়া পর্বতমালা নিয়ে নতুন মেঘালয় রাজ্য গঠিত হয়। ইংরেজি এ রাজ্যের সরকারি ভাষা, তবে অন্যান্য প্রধান কথিত ভাষার মধ্যে খাসি, নার ও গারো উল্লেখ্যযোগ্য। মেঘালয় মাতৃতান্ত্রিক, সংসারের ছোটমেয়ে মায়ের যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, সে-ই বাবা-মায়ের দেখাশুনো করে।

মেঘালয়ের বৃষ্টিভুক পার্বত্য অঞ্চল

এলিফ্যান্ট ফলস্

মেঘালয় ভারতের সবচেয়ে আর্দ্র অঞ্চল– বছরে গড়ে ১২ হাজার মিলিমিটার (৪৭০ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়। রাজ্যের ৭০ শতাংশ বনাঞ্চল। মেঘালয় উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য-প্রতিবেশ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এর পার্বত্য বনাঞ্চল উত্তর ও দক্ষিণের নীচু জমির গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন থেকে আলাদা। এসব বন স্তন্যপায়ী, পশুপাখি ও গাছপালার জীববৈচিত্র্যে ভরপুর।

মেঘালয় প্রধানত কৃষি ও বনজ অর্থনীতিনির্ভর। খাদ্যশস্যের মধ্যে আলু, ধান, ভুট্টা, অনারস, কলা, পেঁপে, বিভিন্ন ধরনের মসলা উল্লেখযোগ্য। সেবাখাতের মধ্যে আবাসন ও বীমার নাম করা যেতে পারে। রাজ্যের গড় দেশজ উৎপাদন ২০১২ সালে ছিল ১৬ হাজার ১৭৩ কোটি রুপি (২৪০ কোটি ডলার)। ভূতাত্ত্বিকভাবে খনিজসমৃদ্ধ হলেও মেঘালয়ে কোন উল্লেখযোগ্য শিল্প গড়ে ওঠেনি। জাতীয় মহাসড়কের ১১৭০ কিলোমিটার এ রাজ্যে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের এক প্রধান লজিস্টিক কেন্দ্র।

ইতিহাস

প্রতিবেশী ভারতীয় রাজ্যসমূহের মত মেঘালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব রয়েছে। এখানে নব্যপ্রস্তরযুগ থেকে মানুষের বসবাস। খাসি, গারো ও প্রতিবেশী রাজ্যের উচ্চ এলাকায় এসব নব্যপ্রস্তরযুগীয় স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। নব্যপ্রস্তরযুগীয় কায়দায় আজও এখানে জুম বা বদলি চাষাবাদ (Shifting Agriculture) চালু আছে। ধানের স্বদেশীকরণের মাধ্যমে মানবেতিহাসে মেঘালয়ের গুরুত্ব নির্ধারিত। ধানের উৎস নিয়ে অন্যতম কৌতূহলোদ্দীপক মতবাদ প্রণেতা ইয়ান গ্লোভার বলেছেন, 'ভারত হচ্ছে ২০ সহস্রাধিক বিশেষ জাতের ধানের বৃহত্তম বৈচিত্র্যের কেন্দ্রভূমি এবং উত্তর-পূর্ব ভারত হচ্ছে দেশজ ধানের একক অনুকূল এলাকা।' মেঘালয় পাহাড়ে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে প্রাচীনকাল থেকে এখানে মানব বসতির উদাহরণ পাওয়া গেছে।

আসাম রাজ্য থেকে ২টি জেলা খাসি ও জৈন্তিয়া পর্বতমালা এবং গারো পর্বতমালা নিয়ে ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি মেঘালয় রাজ্য গঠিত হয়। পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাবার আগে ১৯৭০ সালে মেঘালয়কে আধা-স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসার আগে খাসি, গারো ও জৈন্তিয়া উপজাতীয়দের নিজস্ব রাজ্য ছিল। পরে ব্রিটিশরা মেঘালয়কে আধা-স্বাধীন মর্যাদা দিয়ে ১৮৩৫ সালে আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করে। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের ফলে মেঘালয় নতুন প্রদেশ ইস্টার্ন বেঙ্গল ও আসামের অংশে পরিণত হয়। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে মেঘালয় আসামের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। ভারত সরকার আইন, ১৯১৯-এর ৫২ক ধারা অনুসারে ১৯২১ সালের ৩ জানুয়ারি গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিল খাসি রাজ্য ছাড়াও বর্তমান মেঘালয়ের অনেক এলাকাকে 'পশ্চাৎপদ এলাকা' ঘোষণা করেন।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময় বর্তমান আসামের ২টি জেলা নিয়ে মেঘালয় গঠিত হয় এবং আসাম রাজ্যের মধ্যে সীমিত স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। ১৯৬০ সালে একটি স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। আসাম পুনর্গঠন (মেঘালয়) আইন, ১৯৬৯-এ মেঘালয়কে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। ১৯৭০ সালের ২ এপ্রিল আইনটি কার্যকর হয় এবং আসাম থেকে স্বায়ত্তশাসিত মেঘালয় রাজ্যের জন্ম হয়। ১৯৭১ সালে লোকসভায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকা (পুনর্গঠন) আইন পাশ হলে মেঘালয় পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে এবং ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারি একটি নিজস্ব আইনসভাসহ পূর্ণ রাজ্যে পরিণত হয়।

ভূগোল

মেঘালয় উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম 'সেভেন সিস্টার স্টেট'। উপত্যকা ও উঁচু মালভূমি অধ্যুষিত পার্বত্যময় মেঘালয় রাজ্য ভূতাত্ত্বিকভাবে সমৃদ্ধ। মেঘালয় প্রত্নপাথরে গঠিত হওয়ায় কয়লা, চুনাপাথর, ইউরেনিয়াম ও সিলিমেনাইট সমৃদ্ধ। অধিকাংশ অঞ্চল বৃষ্টিভুক ও মৌসুমি হলেও মেঘালয়ে অনেক নদী আছে। গারো পর্বতমালার নদীগুলো হচ্ছে দারিং, সান্দা, বান্দ্রা, বোগাই, দারেং, সিমসাং, নিতাই ও ভূপাই। মধ্য ও পূর্বাঞ্চলীয় মালভূমির নদীগুলি হচ্ছে খ্রি, ডিগারু, উমিয়াম, কিঙশি (জাদুকাটা), মওপা, উমিয়াম বা বড়পানি, উনগোট ও মিন্টডু। দক্ষিণাঞ্চলীয় খাসি পার্বত্য অঞ্চলের নদীগুলি গভীর গিরিসঙ্কট ও অনেক সুন্দর সুন্দর ঝর্না তৈরি করেছে। খাসি পর্বতে অবস্থিত মেঘালয়ের শিলং শৃঙ্গে ভারতীয় বিমান বাহিনির একটি স্টেশন রয়েছে। এর উচ্চতা ১৯৬১ মিটার।

জলবায়ু

কোন কোন এলাকায় বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত সর্বোচ্চ ১২ হাজার মিমি (৪৭০ ইঞ্চি) নিয়ে মেঘালয় পৃথিবীর আর্দ্রতম স্থান। গারো পর্বতমালা নিয়ে গঠিত পশ্চিমাঞ্চলীয় মালভূমি অধিকতর নীচু বলে সারাবছর তাপমাত্রা উষ্ণ থাকে। উচ্চ মালভূমির শিলং এলাকার তাপমাত্রা সাধারণত শীতল। এ এলাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৮২ ডিগ্রি ফারেনহাইট), শীতকালীন তাপমাত্রা শূন্যর কাছাকাছি। শিলংয়ের দক্ষিণে খাসি পর্বতমালায় অবস্থিত সোহ্‌রা (চেরাপঞ্জি) শহরে এক মাসে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়। অপরদিকে সোহ্‌রার নিকটবর্তী মওসিনরাম গ্রামে এক বছরে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়।

মেঘালয়ের প্রায় ৭০ শতাংশ বনাঞ্চল। এর মধ্যে ৯ হাজার ৪৯৬ বর্গ কিমি (৩ হাজার ৬৬৬ বর্গমাইল) প্রাথমিক ঘন বন। মেঘালয়ের বন এশিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ উদ্ভিদ বসতি। প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে এসব বনাঞ্চল উদ্ভিদ ও প্রাণি জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। মেঘালয় বনাঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র অংশ 'পবিত্র' বলে পরিচিত। এটি প্রাচীন বনের একটি ক্ষুদ্র অংশ– শত শত বছর ধরে স্থানীয় সম্প্রদায়গুলো ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস থেকে এ বনাঞ্চল রক্ষা করে চলেছে। এখানে অনেক বিরল উদ্ভিদ ও প্রাণির বাস। পশ্চিম গারো পর্বতমালার নকরেক বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ফরেস্ট এবং দক্ষিণ গারো পর্বতমালার বালফকরাম জাতীয় উদ্যান মেঘালয়ের সবচেয়ে সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য ভরপুর এলাকা বলে বিবেচিত। এছাড়া মেঘালয়ে ৩টি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য রয়েছে। এগুলি হচ্ছে লংখাইলেম বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য, সিজু অভয়ারণ্য ও বাঘমারা অভয়ারণ্য। এসব অভয়ারণ্যে পতঙ্গভুক কলস

জুম বা বদলি চাষাবাদ

শিলংয়ের অপার্থিব নৈসর্গিক দৃশ্য

উদ্ভিদ নেপেনথেস খাসিয়ানার দেখা মেলে।

জলবায়ু ও স্থানিক অবস্থার বৈচিত্র্যের কারণে মেঘালয় বনাঞ্চলে বিপুল উদ্ভিদ বৈচিত্র্য বিদ্যমান– এখানে অনেক ধরনের পরজীবী, পরগাছা, খাদ্য সঞ্চয়কারী মোটা পাতা ও কাণ্ডের ক্যাকটাস জাতীয় উদ্ভিদ ও গুল্ম রয়েছে। দু'টি গুরুত্বপূর্ণ গাছের জাত হচ্ছে সোরিয়া রোবাস্টা (শাল) ও টেকটোনা গ্রান্ডিজ (সেগুন)। মেঘালয় নানা ধরনের ফলমূল, সবজি, মসলা ও ভেষজ উদ্ভিদে পূর্ণ। এখানে প্রায় ৩২৫ ধরনের অর্কিড পাওয়া যায়। খাসি পর্বতমালার মওসমাই, মওমলু ও সোহ্‌রারিম বনাঞ্চলে অনেক জাতের অর্কিড দেখা যায়।

মেঘালয়ে অনেক ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণি, পাখি ও পতঙ্গ দেখা যায়। গুরুত্বপূর্ণ স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মধ্যে হাতি, ভল্লুক, লাল পান্ডা, গন্ধগোকুলা, বেজি, নকুল, ইঁদুর, গাউর, বুনো মোষ, হরিণ, বুনো শুয়োর ও অনেক জাতের বানর। মেঘালয় অনেক জাতের বাদুড়ের আবাসস্থল। সিজু গুহার চুনাপাথরের গিরিগুহায় দেশের অনেক বিরল জাতের বাদুড় দেখা যায়। মেঘালয়ের সকল জেলায় হুলক উল্লুকের দেখা মেলে।

মেঘালয়ের সর্বত্র দৃশ্যমান সরীসৃপ হচ্ছে টিকটিকি, গিরগিটি, কুমির ও কচ্ছপ। এখানে অজগর, গোখরা, কিং কোবরা, কোরাল স্নেক ও কেউটেসহ অনেক ধরনের সাপ পাওয়া যায়।

মেঘালয়ের বনাঞ্চলে ৬৬০ প্রজাতির পাখি দেখা যায়, যার অরেকগুলিই হিমালয় পাদদেশের পর্বতশ্রেণি, তিব্বত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দৃশ্যমান। মেঘালয়ের বনাঞ্চলে ৩৪ প্রজাতির বিপন্ন আর ৯ প্রজাতির অতি বিপন্ন পাখি রয়েছে। মেঘালয়ে সাধারণত ফাসিয়ানিডায়ি, এনাটিডায়ি, পেডিসিপেডিডায়ি, সিকোনাইডায়ি, থ্রেসকিঅরনিথিডায়ি, আরডেইডায়ি, পেলিক্যানিডায়ি, ফালাক্রোকোরাসিডায়ি, অ্যানহিঙ্গিডায়ি, ফ্যালকনিডায়ি, এক্সিপিট্রিডায়ি, ওটিডিডায়ি, র‍্যালিডায়ি, হেলিঅরনিথি ডায়ি, গ্রুইডায়ি, টার্নিসিডায়ি, বুরহিনিডায়ি, চ্যারাড্রিডায়ি, গ্লারিওলিডায়ি, স্কোলোপাসিডায়ি, জ্যাক্যানিডায়ি, কলাম্বিডায়ি, সিট্টাসিডায়ি, কুকুলিডায়ি প্রভৃতি ৪৪ পরিবারের পাখি দেখা যায়। গ্রেট ইন্ডিয়ান হর্নবিল মেঘালয়ের সবচেয়ে বড় পাখি। অন্যান্য আঞ্চলিক পাখির মধ্যে আছে ধূসর ময়ূর, ইন্ডিয়ান পারাকিট, সবুজ পায়রা ও নীলকণ্ঠ পাখি। মেঘালয়ে রয়েছে ২৫০ জাতের প্রজাপতি, ভারতে প্রাপ্ত প্রজাতির প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

জনমিতি

মেঘালয়ের জনসংখ্যায় জাতিগত খাসি ৫০%, গারো ২৭.৫%, বাঙালি ১৭%, নেপালি ৮.২৬%, কোচ ১.৮%, জৈন্তিয়া ২.৫%, হাজং ২.৮%, কুকি ০.৪৮% এবং অন্যান্য ১০.৬৬%। মেঘালয়ের জনসংখ্যা প্রধানত উপজাতীয়। ২০১১ সালে জনগণনার প্রাদেশিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ভারতের সেভেন সিস্টার্স সেটটস্-এর মধ্যে মেঘালয়ের জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি– ২৭.৮২%। ২০১১-য় জনসংখ্যা ছিল ২৯ লাখ ৬৪ হাজার ৭ জন, এর মধ্যে নারী ১৪ লাখ ৯২ হাজার ৬৬৮ জন।

ধর্ম

২০১১ সালের জনমিতি অনুযায়ী মেঘালয়ে খ্রিস্টান ৭৪.৫৯%, হিন্দু ১১.৫২%, মুসলমান ৪.৩৯%, শিখ ০.১০%, বৌদ্ধ ০.৩৩%, জৈন ০.০২%, উপজাতীয় ধর্মাবলম্বী ৮.৭০% এবং অন্যান্য ০.৩৫%। খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রেসবিটারিয়ান, ব্যাপ্টিস্ট ও ক্যাথলিক প্রধান। গারো উপজাতীয়দের ৯০% এবং খাসিদের ৮০% খ্রিস্টান। অপর দিকে হাজংদের ৯৭% ও কোচদের ৯৮.৫৩% হিন্দু। গারোদের অধিকাংশ খ্রিস্টান হয়ে গেলেও অনেকে তাদের মূল ধর্ম (সংসারেক) ধরে রেখেছে। খাসিদের আদি ধর্মের নাম নিয়াম খাসি / শ্‌নোঙ/ নিয়াম্‌ত্রে। খাসিদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ও আছে।

ভাষা

২০০১-এর জন গণনা অনুযায়ী মেঘালয়ে খাসি ভাষায় ৪৭.০৫%, গারো ভাষায় ৩১.৪১%, বাংলা ভাষায় ৭.৯%, নেপালি ভাষায় ২.২৪%, হিন্দি ভাষায় ২.১৫%, মারাঠি ভাষায় ১.৬৭%, অসমীয় ভাষায় ১.৫৫%, ও অন্যান্য ভাষায় ৭.০১% মানুষ কথা বলে। ইংরেজি মেঘালয়ের সরকারি ভাষা ও সর্বত্র প্রচলিত। মেঘালয়ের অন্য দুই প্রধান ভাষা হচ্ছে খাসি ও গারো। খাসি ভারতে আজ পর্যন্ত টিকে থাকা অতি অল্পসংখ্যক মোন-খ্‌মের (Mon-Khmer– অস্ট্রোএশিয়াটিক গণের মোন-খ্‌মের পরিবারের একটি শাখা) ভাষার একটি। গারো ভাষার সঙ্গে কোচ ও বোড়ো ভাষায় ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। মেঘালয়ে আরো অনেক ভাষা রয়েছে। জৈন্তিয়া পাহাড়ের জনগণের ভাষা নার (Pnar)। এর সঙ্গে খাসি ভাষার মিল আছে।

জেলাসমূহ

মেঘালয়ে বর্তমানে ৩টি পার্বত্য বিভাগে ১১টি জেলা রয়েছে। জৈন্তিয়া পর্বতমালায় রয়েছে পশ্চিম জৈন্তিয়া পর্বতমালা (জোওয়াই), পূর্ব জৈন্তিয়া (খ্লিয়েরিয়াত), খাসি পার্বত্য বিভাগে পূর্ব খাসি পর্বতমালা (শিলং), পশ্চিম খাসি পর্বতমালা (নংস্টোইন), দক্ষিণ-পশ্চিম খাসি পর্বতমালা (মওকিরওয়াত), রি-ভোই (নঙ্‌পোহ্‌); গারো পার্বত্য বিভাগে উত্তর গারো পর্বতমালা (রেসুবেলপাড়া) পূর্ব গারো পর্বতমালা (উইলিয়ামনগর), দক্ষিণ গারো পর্বতমালা (বাঘমারা), পশ্চিম গারো পর্বতমালা (তুরা) ও দক্ষিণ-পশ্চিম গারো পর্বতমালা (আমপাতি)।

১৯৭২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি জৈন্তিয়া জেলার সৃষ্টি। এর ভৌগোলিক আয়তন ৩ হাজার ৮১৯ বর্গ কিমি। এটি বৃহত্তম কয়লা ও চুনাপাথর উৎপাদনকারী অঞ্চল। পূর্ব ও পশ্চিম খাসি পার্বত্য জেলার সৃষ্টি ১৯৭৬ সালের ২৮ অক্টোবর। রি-ভোই জেলার সৃষ্টি ১৯৯২ সালের ৪ জুন। অপরদিকে পূর্ব গারো পার্বত্য জেলা গঠিত হয় ১৯৭৬ সালে। এর সদর দপ্তর উইলিয়ামনগরে (পূর্ব নাম সিমসানগিরি) অবস্থিত। এখানে একাধিক কয়লাখনি আছে। ২০১২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মেঘালয়ে ১১টি জেলা, ১৬টি শহর ও ৬ হাজার ২৬টি গ্রাম রয়েছে।

শিক্ষা

সরকারি, বেসরকারি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত মেঘালয়ের স্কুলগুলির ভাষা ইংরেজি। তবে অসমীয়, বাংলা, হিন্দি, গারো, খাসি, মিজো, নেপালি ও উর্দু ঐচ্ছিক ভাষা হিসেবে শেখানো হয়। মেঘালয়ে ইউনির্ভাসিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ইউনির্ভাসিটি অফ টেকনোলজি এন্ড

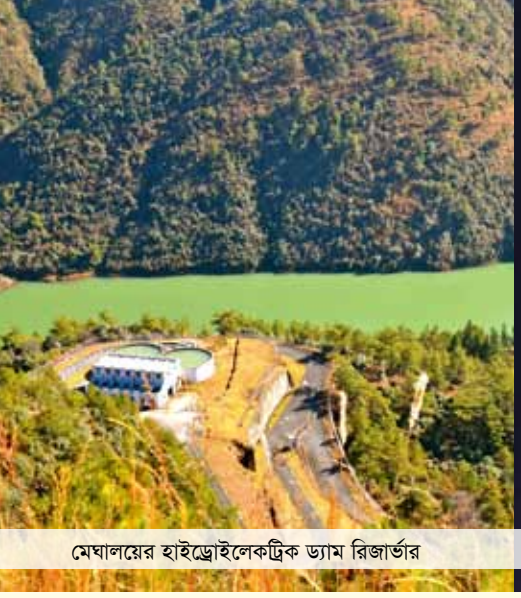
মেঘালয়ের হাইড্রোইলেকট্রিক ড্যাম রিজার্ভার

পতঙ্গভুক কলস উদ্ভিদ নেপেনথেস খাসিয়ানা

হুলক উল্লুক

ম্যানেজমেন্টসহ ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সেন্ট এডমন্ড'স কলেজ, লেডি কেনি কলেজ, সেন্ট মেরি'স কলেজের মত বিখ্যাত কলেজসহ ২১টি কলেজ রয়েছে। এছাড়া ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, নর্থ ইস্টার্ন ইন্দিরা গান্ধী রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অফ হেল্‌থ এন্ড মেডিক্যাল সায়েন্সেস, মেঘালয় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ প্রফেশনাল স্ট্যাডিজ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজির মত আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

সরকার ও রাজনীতি

মেঘালয়ে বর্তমানে ৬০ সদস্যের বিধানসভা রয়েছে। শিলং ও তুরা থেকে লোকসভায় দু'জন প্রতিনিধি এবং রাজ্যসভায় একজন প্রতিনিধি রয়েছেন। রাজ্য সৃষ্টির পর গৌহাটি হাই কোর্টে আইনি কাজকর্ম চলত তবে ২০১৩ সালের মার্চ মাসে গৌহাটি হাই কোর্ট থেকে শিলং হাই কোর্টকে আলাদা করা হয়েছে। এখন রাজ্যের নিজস্ব উচ্চ আদালত বিদ্যমান।

ভারতে প্রচলিত পঞ্চায়েতীরাজের সঙ্গে মেঘালয়ের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী শাসন ব্যবস্থার সংঘাত সৃষ্টির আশংকায় গোপীনাথ বরদলইয়ের নেতৃত্বে স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ (এডিসি) গঠনের সুপারিশ গৃহীত হয় এবং সে-মোতাবেক মেঘালয়ে খাসি পার্বত্য স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ, গারো পার্বত্য স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ এবং জৈন্তিয়া পার্বত্য স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

অর্থনীতি

মেঘালয় প্রধানত কৃষি অর্থনীতিনির্ভর রাজ্য। মোট জনশক্তির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি ও কৃষিসংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত। তবে কৃষি থেকে রাজ্যের গড় দেশজ উৎপাদন (নেট স্টেট ডমেস্টিক প্রোডাক্ট) মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। জনসংখ্যার একটা বড় অংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকলেও মেঘালয়ে অন্যান্য রাজ্য থেকে খাদ্য আমদানি করতে হয়। ২০১২ সালে এ রাজ্যের গড় দেশজ উৎপাদন ছিল ১৬ হাজার ১৭৩ কোটি রুপি। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সূত্রমতে রাজ্যের প্রায় ১২% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অপ্রতুল অবকাঠামো অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির বড় অন্তরায়। মেঘালয় মূলত কৃষিভিত্তিক রাজ্য। প্রায় ৮০% মানুষ কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। মেঘালয়ের মাত্র ১০% জমিতে কৃষিকাজ হয়। চাষযোগ্য এলাকার একটি অংশে জুম চাষ হয়। ধান এখানকার প্রধান খাদ্যশস্য। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্যের মধ্যে ভুট্টা, গম, ডাল ও অন্যান্য দানা শস্য উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আলু, আদা, হলুদ, গোলমরিচ, বাদাম, তেজপাতা, পান, কার্পাস তুলা, পাট, মেসতা, সরিষা বীজ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। উদ্যান শস্যের মধ্যে কমলা লেবু, আনারস, পেয়ারা, লিচু, কলা, কাঠাল, তাল, নাসপতি, পিচ, উল্লেখযোগ্য। সুপারি গাছ রাজ্যের সর্বত্রই চোখে পড়ে। অন্যান্য রোপিত শস্যের মধ্যে চা, কপি, কাজু বাদামের চাষ সম্প্রতি শুরু হয়েছে এবং দিনে দিনে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

মেঘালয় প্রাকৃতিক সম্পদের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। কয়লা, চুনাপাথর, সিলিমেনাইট, কাওলিন এবং অন্যান্যের মধ্যে গ্রানাইট প্রধান। ঘন বনাঞ্চল, সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য ও অসংখ্য জলাশয় থাকা সত্ত্বেও দুর্বল শিল্পায়ন ও অবকাঠামোর কারণে অর্থনীতির উন্নয়নে এসব প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। জৈন্তিয়া পার্বত্য জেলায় সম্প্রতি দুটি বড় সিমেন্ট কারখানা চালু হয়েছে। আরো কয়েকটি চালুর পথে। অসংখ্য উঁচু পর্বতমালা, গভীর গিরিখাত ও প্রচুর বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও রাজ্যের বিদ্যুৎ অবকাঠামো বেশ দুর্বল। রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা অথচ উৎপাদিত হয় মাত্র ১৮৫ মেগাওয়াট– ব্যবহৃত হয় ৬১০ মেগাওয়াট। ফলে বিদ্যুৎ আমদানি করতে হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে অনেকগুলি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন তাপ ও জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হলে মেঘালয় বিদ্যুৎ রপ্তানি করতে সক্ষম হবে।

২০১১ সালে মেঘালয়ের সাক্ষরতার হার ছিল ৭৫ দশমিক ৫– ভারতের অন্যতম অগ্রণী রাজ্য। ২০০৬ সালের গণনা অনুযায়ী রাজ্যে ৫ হাজার ৮৫১টি প্রাথমিক, ১হাজার ৭৫৯টি মাধ্যমিক ও ৬৫৫টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। শিলংয়ে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে ক্লাউড কম্পিউটিং ইঞ্জিনিয়ারিং চালু করা হয়েছে আইবিএম ও ইউনির্ভাসিটি অফ পেট্রোলিয়াম এন্ড এনার্জি স্ট্যাডিজের সহযোগিতায়। শিলংয়ে দেশের অন্যতম শীর্ষমানের ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট অবস্থিত।

২০১২-র হিসেব মতে, রাজ্যের ১৩টি সরকারি ডিসপেনসারি, ২২টি কমিউনিটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ৯৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৪০৮টি উপ-কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে ৩৭৮জন ডাক্তার, ৮১জন ফার্মাসিস্ট, ৩৩৭জন স্টাফ নার্স, ৭৭জন ল্যাব টেকনিশিয়ান নিয়োজিত আছেন। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ক্যানসার ও মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য রাজ্য বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। রাজ্যের ৪২.৩% লোক এখনও স্বাস্থ্যসেবার বাইরে।

সমাজ ও সংস্কৃতি

মেঘালয়ের ৩ প্রধান উপজাতি খাসি, গারো ও জৈন্তিয়াদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাষা রয়েছে। মেঘালয়ের অধিকাংশ মানুষ মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জীবন পরিচালনা করে। সাধারণত ছোটমেয়ে মায়ের সহায়-সম্পদের উত্তরাধিকারিণী। মেয়ে না থাকলে পুত্রবধূ কিংবা পালিত মেয়ে পরিবারের দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

খাসি ও জৈন্তিয়া উপজাতীয়রা ঐতিহ্যবাহী মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা মেনে চলে যেখানে খুম খাতদুহ্ (সর্বকনিষ্ঠা কন্যা) পরিবারের সকল সম্পদ ও দায়িত্বের উত্তরাধিকার লাভ করে। তবে পুরুষের দিকে, বিশেষ করে মামা পরোক্ষভাবে বংশানুক্রমিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ করে। সম্পত্তি বিক্রি-বাটায় তার সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে কোন কন্যা না থাকলে তারা অন্য পরিবার থেকে কন্যা দত্তক নেয়। এ প্রথাকে বলে 'ইয়া রাপ ইং'। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে সেই দত্তক কন্যা পরিবারের 'কা ত্রাই ইং' (পরিবারের প্রধান) হয়।

গারোদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা কন্যা পরিবারের সহায়-সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হয়। কোন কারণে সে অপারগ হলে পিতা-মাতা অন্য কন্যাকে মনোনীত করতে পারে। সে তখন পরিবারের জন্য 'নোখ্না'

ধূসর ময়ূর

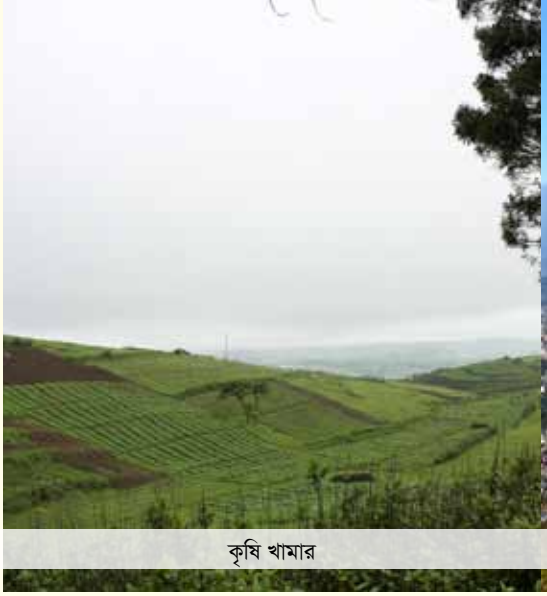
কৃষি খামার

বিহঙ্গাবলোকনে রাজধানী শিলং

(বাড়ি/ঘরের জন্য) হয়। আর কোন কন্যা সন্তান না থাকলে পুত্রবধূ (বোহারি) বা দত্তক কন্যা (দেরাগাতা) পরিবারে থাকার জন্য আসে এবং সব বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়। মেঘালয়ে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম টিকে থাকা মাতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি।

খাসি, জৈন্তিয়া ও গারোদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা শত শত বছর ধরে বিদ্যমান। খাসিদের প্রত্যেকটি গোত্রের নিজস্ব পরিষদ রয়েছে যা নাম 'দরবার কুর'। গোত্রপ্রধান এর সভাপতি। এখানে গোত্রের অভ্যন্তরীণ সব বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। একইভাবে গ্রামে একটি স্থানীয় পরিষদ থাকে যার নাম 'দরবার শ্নং'। এখানে সভাপতি গ্রামপ্রধান। সন্নিহিত খাসি গ্রামগুলির সমন্বয়ে গঠিত এ রাজনৈতিক পরিষদে আন্তঃগ্রাম বিষয়াদির মীমাংসা করা হয়। আবার স্থানীয় পরিষদসমূহের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাইডস্– এটিই হচ্ছে খাসিদের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ– এর নাম হচ্ছে সিয়েমশিপ। বিভিন্ন রাইডস্ একজন প্রধান নির্বাচন করে যিনি সিয়েম (রাজা) হিসেবে পরিচিত। 'দরবার হিমা' বা রাজ্য পরিষদের মাধ্যমে রাজা খাসি রাজ্য শাসন করেন।

জৈন্তিয়াদেরও রয়েছে ৩-স্তরের রাজনৈতিক ব্যবস্থা। এদের রাইডস্ প্রধান হলেন 'দলই'। গারোদের গ্রামগুলি নিয়ে গঠিত হয় 'এ-কিং'। 'নোকমা'দের তত্ত্বাবধানে এ-কিং পরিচালিত হয়। নোকমারা বিচার ও আইন– উভয় দায়িত্ব পালন করে। তবে গারোদের মধ্যে তেমন সুসংবদ্ধ পরিষদ বা দরবার নেই।

উৎসব

খাসিদের জীবনে নাচ হচ্ছে সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু। নাচ হয় শ্নং (গ্রাম), রাইড (গুচ্ছগ্রাম) এবং হিমা (রাইড-এর দল)-য়। এদের উৎসবের মধ্যে কা-শাদ সুক মিনসিয়েম, কা পম-ব্লাগ নংক্রেম, কা-শাদ শিঙ্গউইয়াং-থাংগিয়াপ, শাদ-কিনজোহ্ খাসকাইন, কা বাম খানা শ্নং, উমসান নংখারাই, শাদ বেহ্ সিয়ের উল্লেখযোগ্য।

অন্যদের মত নাচ জৈন্তিয়াদের সংস্কৃতিরও অবিচ্ছেদ্য অংশ। নাচের মাধ্যমে তারা প্রকৃতির বন্দনা করে, তাদের জনগণের সাম্য ও সংহতি কামনা করে। জৈন্তিয়াদের উৎসবের মধ্যে আছে বেহ্দিয়েনখ্লাম, লাহো নাচ, সোউইং প্রথা উদ্যাপন।

গারোদের উৎসব তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রকৃতি, ঋতু ও জুম চাষের মত সম্প্রদায়গত অনুষ্ঠানে নাচ করে থাকে। গারোদের প্রধান উৎসবগুলি হচ্ছে ডেন বিলসিয়া, ওয়াংগালা, রংচুগালা, মি আমুয়া, মঙ্গোনা, গ্রেংডিক বাএ, জামাং সিয়া, জা মেগাপা, সা সাট রা চাকা, আজেআওর আহাওইয়া, ডোরে রাতা নাচ, ক্যাম্বিল মেসারা, ডো'ক্রুসুয়া, সরম চা'য়ে, আ সে মানিয়া বা টাটা উদ্যাপন।

হাজংরা হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রথা পালন করে। প্রত্যেকটি হাজং পরিবারে একটি প্রার্থনার দেওঘর থাকে, যেখানে তারা সকাল-সন্ধ্যা পূজা-আচ্চা করে। গাঁওয়ের সদস্যপদ প্রত্যেক হাজংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক। একটি হাজং গ্রাম একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের মত। হাজংদের লোকনৃত্য/লোকসংগীত; লিবা-টানা, চরখিলা; থুবা-মাগা; গুপিনী গাহেন; কথা গাহেন; পুইলা গুসা/রুবা-লাগা গাহেন, গিটলু গাহেন প্রভৃতি।

দক্ষিণ মেঘালয়ের মওসিনরামে অবস্থিত মওজিমবুই গুহায় একটি বিরাট স্ট্যালাগমাইট প্রকৃতিগতভাবে শিবলিঙ্গের আকার ধারণ করেছে। কিংবদন্তী আছে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রানি সিংহের শাসনামলে জৈন্তিয়া পর্বতমালায় এই শিবলিঙ্গটি পাওয়া যায় (নাম হটকেশ্বরাত)। প্রতি বছর শিবরাত্রি উৎসবে জৈন্তিয়া উপজাতির হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করে।

পরিবহন

১৯৪৭-এ দেশভাগের সময় উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার সঙ্গে সারাদেশের সংযোগ ছিল সামান্য। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে শিলিগুড়ি করিডোর ছিল একমাত্র যোগাযোগ সংযোগ। প্রতিবেশী আসামের গৌহাটি হয়ে মেঘালয়ে আসতে হয়। ১৯৭২ সালে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর মেঘালয়ে ১৭৪ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়কসহ ২হাজার ৭৮৬.৬৮ কিমি সড়কপথ ছিল মাত্র। ২০১১ সালের মার্চে রাস্তার ঘনত্ব ছিল প্রতি ১০০ বর্গ কিমিতে ৪১.৬৯ কিমি– যা জাতীয় ঘনত্ব প্রতি ১০০ বর্গ কিমিতে ৭৫ কিমি-র চেয়ে অনেক কম। তবে মেঘালয় গণপূর্ত বিভাগ পর্যায়ক্রমে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করে চলছে।

জাতীয় মহাসড়কের মাধ্যমে মেঘালয়ের সঙ্গে আসামের শিলচর, মিজোরামের আইজল, ত্রিপুরার আগরতলা যুক্ত। ২০১৪ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে মেঘালয়ের মেন্দিপাথর রেলস্টেশন ও গৌহাটির সঙ্গে নিয়মিত ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। গৌহাটি থেকে মেঘালয়ের বিরনিহাট পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এই রেলপথকে রাজধানী শিলিং পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। গৌহাটি-শিলং মহাসড়কের উমরোইয়ে (শিলং থেকে ৩০ কিমি দূরে) শিলং বিমানবন্দর অবস্থিত। ২০১১ সালের জুন মাসে নতুন টার্মিনাল উদ্বোধন করা হয়েছে। এয়ার ইন্ডিয়া রিজিওন্যালের শিলং-কলকাতা ফ্লাইট চালু আছে।

পর্যটন

আগে মেঘালয়ে আসতে পর্যটকদের বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন হত। ১৯৫৫ সালে এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। উঁচু মালভূমি, কুয়াশা আর নৈসর্গিক দৃশ্যাবলির জন্যে একে স্কটল্যান্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়। মেঘালয়ে দুটি জাতীয় উদ্যান ও ৩টি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য রয়েছে। মেঘালয় আপনাকে পাহাড়ে ওঠা, খাড়া পাথরে চড়া, ট্রেকিং-হাইকিং-কেভিং ও জলক্রীড়ার মত অভিযানমূলক পর্যটনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। উমিয়াম হ্রদে একটি জলক্রীড়া কমপ্লেক্স আছে যেখানে রো বোট, প্যাডেল বোট, সেইলিং বোট, ক্রুইজ বোট, ওয়াটার স্কুটার ও স্পিড বোটে চড়ার সুযোগ আছে।

চেরাপুঞ্জি উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য। শহরটি 'গাছের শেকড়ের সেতু'র জন্য বিখ্যাত। এটি শিলংয়ের দক্ষিণে অবস্থিত।

রাজ্যের জনপ্রিয় ঝর্নাগুলো হচ্ছে এলিফ্যান্ট ফলস্, শাদথাম ফলস, ওয়েই নিয়া ফলস্, বিশপ ফলস্, নোখলিকাই ফলস্, ল্যাংশিয়াং ফলস্ ও সুইট ফলস্। মওসিনরামের নিকটবর্তী জাকরেমের উষ্ণ প্রস্রবণের রোগহর ঔষধগুণ আছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

পশ্চিম খাসি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত নঙখ্নাম দ্বীপ মেঘালয়ের সর্ববৃহৎ এবং এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী দ্বীপ। নঙস্টোইন থেকে ১৪ কিমি দূরে কিঙশি নদী ফানলিয়াং ও নামলিয়াং নদী নামে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটি গভীর গিরিখাতে পৌঁছনোর আগে ৬০ ফুট উঁচু একটি সুন্দর জলপ্রপাতের, আর ফানলিয়াং নদীর বালুকাবেলা একটি সুন্দর হ্রদের সৃষ্টি করেছে।

মেঘালয় পবিত্র তরুবীথির জন্যও বিখ্যাত। প্রাচীনকাল থেকে লোকজ দেবদেবী, বৃক্ষ বা কিছু ধর্মীয় প্রতীকের জন্য এ-সব ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বনাঞ্চল উৎসর্গীকৃত। মওফ্লাঙ (ল লিঙডোহ্) হচ্ছে মেঘালয়ের তেমনই একটি বিখ্যাত পবিত্র বন। এটি শিলং থেকে ২৫ কিমি দূরে অবস্থিত।

মেঘালয়ে অনেক প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম হ্রদ রয়েছে। গৌহাটি-শিলং মহাসড়কের পাশে উমিয়াম হ্রদ (বড়পানি নামে সমধিক পরিমিত) পর্যটকদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ কেন্দ্র। এখানে থাংখারাং পার্ক, ইকো পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন ও লেডি হায়দারি পার্কসহ অনেক উদ্যান রয়েছে। শিলং থেকে ৯৬ কিমি দূরে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ডাউকি মেঘালয়ের উচ্চতম পর্বতশ্রেণি– এর নৈসর্গিক দৃশ্য অপূর্ব। এছাড়া বলপাখরাম জাতীয় উদ্যানের পশুপাখি ও দৃশ্যাবলির আকর্ষণ কম নয়। গারো পাহাড়ের নোক্রেখ জাতীয় উদ্যান অনেকানেক বন্যপ্রাণির জন্য বিখ্যাত।

উপমহাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘ ও গভীর গুহাসহ মেঘালয়ে প্রায় ৫শো চুনাপাথর ও বেলেপাথরের প্রাকৃতিক গুহা রয়েছে। ক্রেম লিয়াত প্রা হচ্ছে দীর্ঘতম আর সিনরাঙ পামিয়াং হচ্ছে গভীরতম গুহা। দু'টিই জৈন্তিয়া পাহাড়ে অবস্থিত। যুক্তরাজ্য, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, আয়ারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের গুহা-অভিযাত্রীরা দশকের পর দশক ধরে এসব গুহা আবিষ্কার করেছেন। এসবের অনেকগুলিই এখনও পর্যটক দ্রষ্টব্য হিসেবে উন্নত কিংবা পরিচিত হয়নি। মেঘালয়ের অন্যান্য পর্যটক আকর্ষণ কেন্দ্রগুলি হচ্ছে–

জাফরেম: সালফার মিশ্রিত উষ্ণ প্রস্রবণ, স্বাস্থ্যনিবাস। এর জল রোগহর বলে জনশ্রুতি আছে। শিলং থেকে ৬৪ কিমি দূরে।

রানিকর: শিলং থেকে ১৪০ কিমি দূরে অবস্থিত নৈসর্গিক দৃশ্যের জন্য খ্যাত। এ্যাংলিংয়ের দৃশ্য জনপ্রিয়। এখানে পার্ক ও অন্যান্য সুপেয় জলের মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

ডাউকি: শিলং থেকে ৯৬ কিমি দূরে সীমান্ত শহর। এখান থেকে প্রতিবেশী বাংলাদেশ দেখা যায়। উমন্গট নদীতে বসন্তকালে বার্ষিক নৌকা বাইচে প্রভূত জনসমাগম হয়।

ক্ষাইদ ডিয়ান থ্লেন ফলস্: সোহ্রার কাছে অবস্থিত এ জলপ্রপাতে খাসি কিংবদন্তীর পৌরাণিক দানব থ্লেনকে গলা কেটে হত্যা করা হয়। এখনও পাথরের গায়ে কুঠারের দাগ দৃশ্যমান।

ডিয়েনগিই শৃঙ্গ: শিলং মালভূমির পশ্চিমে অবস্থিত ডিয়েনগিই শৃঙ্গ শিলং শৃঙ্গ থেকে মাত্র ২০০ ফুট নীচু। ডিয়েনগিই উপরে একটি বিশাল পেয়ালার মত গর্ত রয়েছে, এটি প্রাগৈতিহাসিক লাভার অবশেষ বলে ধারণা করা হয়।

দ্বারক্সুইদ: দানবের দ্বার নামে পরিচিত উমরোই-ভোইলিমবোং সড়ক বরাবর একটি জলপ্রবাহের বিশাল পাথুরে বালির পাড়ে অবস্থিত একটি চমৎকার জলাধার।

কিল্লাং পাথর: মইরাং থেকে ১১ কিমি দূরে অবস্থিত সমুদ্রপৃষ্ট থেকে ৫ হাজার ৪০০ ফুট উঁচুতে লাল গ্রানাইটের লক্ষ-কোটি বছরের পুরনো খাড়া গম্বুজ।

মওফ্লাঙ পবিত্র বনভূমি: শিলং থেকে ২৫ কিমি দূরে অবস্থিত যুগপ্রাচীন কাল থেকে সংরক্ষিত রাজ্যের অন্যতম এই পবিত্র বনভূমি শতাব্দীর পর শতাব্দী জীবাশ্ম জমে নিবিড় গভীর বনের সৃষ্টি করেছে। গাছগুলো এ্যারোইড, পাইপার, ফার্ন সদৃশ পরগাছা ও অর্কিডে আকীর্ণ।

সূত্র **ইন্টারনেট**

• অনুবাদ **মানসী চৌধুরী**

ঘটনাপঞ্জি ❖ নভেম্বর

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

০২ নভেম্বর ১৯৩৫ ❖ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
০২ নভেম্বর ১৯৬৫ ❖ বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানের জন্ম
০৩ নভেম্বর ১৯৩৩ ❖ নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের জন্ম
০৪ নভেম্বর ১৯২৫ ❖ চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের জন্ম
০৫ নভেম্বর ১৮৭০ ❖ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম
১০ নভেম্বর ১৮৪৮ ❖ 'রাষ্ট্রগুরু' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
১০ নভেম্বর ১৯৫৪ ❖ কবি জয় গোস্বামীর জন্ম
১১ নভেম্বর ১৮৮৮ ❖ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্ম
১১ নভেম্বর ১৯০৮ ❖ গজেন্দ্রকুমার মিত্রর জন্ম
১২ নভেম্বর ১৮৯৬ ❖ পক্ষীবিদ সেলিম আলীর জন্ম
১৪ নভেম্বর ১৮৮৯ ❖ জওহরলাল নেহরুর জন্ম ॥ শিশু দিবস
১৯ নভেম্বর ১৮৩৮ ❖ কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম
১৯ নভেম্বর ১৯১৭ ❖ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম
১৯ নভেম্বর ১৯২৩ ❖ সলিল চৌধুরীর জন্ম
২০ নভেম্বর ১৭৫০ ❖ টিপু সুলতানের জন্ম
২৩ নভেম্বর ১৮৯৭ ❖ নীরদচন্দ্র চৌধুরীর জন্ম
২৫ নভেম্বর ১৯৩৪ ❖ কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৬ নভেম্বর ১৮৯৭ ❖ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৭ নভেম্বর ১৮৭৮ ❖ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্ম
৩০ নভেম্বর ১৮৫৮ ❖ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম
৩০ নভেম্বর ১৯০৮ ❖ বুদ্ধদেব বসুর জন্ম

Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!
Coca-Cola
Coca-Cola

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

পাসিং শো

অমর মিত্র

চৌদ্দ.

বাড়ি ফিরে অতীন বলল, পেয়ে যাব হয় তো।

তাই, পেয়ে যাবে, ওরা খুঁজে দেবে? শম্পার যেন বিশ্বাস হয় না। এই ক'দিনে সমস্তটাই যেন না পাওয়ার এক খেলায় মেতেছে তারা। কবে কোন দূর সময়ে গান গেয়েছিল একজন। সেই গানের কথা কেউ মনে রাখেনি, এখন তো বেলা পড়ে আসছে, সেই গান আর খুঁজে পাওয়া যায়? কণ্ঠস্বর ধরে রাখতে এখন একটা মোবাইলেই হয়ে যায়। মানুষ এখন একটির ভিতরেই বহু কিছু ধরে রাখতে শিখেছে। সেই কবে কোন কালে মোমের সিলিন্ডার, ফোনোগ্রাফ থেকে গালার রেকর্ড, তা থেকে ক্যাসেট, শব্দ ধারণ করার টেপ রেকর্ডার, তা থেকে কম্প্যাক্ট ডিস্ক, সিডি। এখন সবই প্রাচীন হয়ে গেছে।

কারা ইন্টারনেটে গান ভরে দিচ্ছে, সেই গান ডাউনলোড করে মোবাইলে ভরে নিলেই হয়। ইউটিউব যেন এক গান আর সিনেমার সমুদ্র। খুঁজলে কী না পাওয়া যায়। শম্পাকে তার ছেলে দেখিয়েছে। এই দ্যাখো মা, বল কোন গান চাও? চোখ বুজে বল।

ইলা বসু। ইলা বসু বাজিয়ে দিল। সুপ্রীতি ঘোষ, বাজিয়ে দিল তা। শুনিয়ে দিল সিলেটি গান। সিলেটে তার মামার বাড়ি ছিল শুনেছে। পরে তারা আসে করিমগঞ্জ, আসাম। মা বিয়ের পর কলকাতা। বরানগর। কিন্তু সেই যে অতুলানন্দ রায় তার গান নেই ইউটিউবে। হারিয়ে গেছে সেই গান।

অতীন বলল, ওরা তো এই কাজটাই পারে শম্পা।

অনেকদিন বাদে তারা পাশাপাশি বসেছিল। অনি নেই। বাইরে নেমেছে গ্রীষ্মের রাত। দক্ষিণ থেকে বাতাস উঠেছে। ঢেউ উঠেছে ঢেউ। অতীন ফেরার সময় গোলাপ এনেছে এক গুচ্ছ। শম্পা তা ফুলদানিতে রেখেছে। শম্পা বলল, কোন কাজ?

গান খুঁজে নেওয়া।

শম্পা জিজ্ঞেস করে, সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি, হারিয়ে যাওয়া গান ওরা খুঁজে আনে।

শম্পা জিজ্ঞেস করল, কীভাবে গো?

অতীন তখন তার গুলাম হুসেন ও আজিজুল বৃত্তান্ত শোনায় শম্পাকে। শুনতে শুনতে শম্পা বলে, তুমি একটা অদ্ভুত মানুষ!

তাই? অতীন তার তিরিশ বছরের পুরনো বউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। শম্পা বলল, হ্যাঁ, তাই, তুমি একটা না একটা নিয়ে আছই।

তোমার কি অসম্মতি আছে শম্পা? অতীন জিজ্ঞেস করে।

তুমি কি দেখেছ অসম্মতি?

অতীন বলল, এইটা না করে আমি কী করতে পারতাম শম্পা?

শম্পা তার গলা জড়িয়ে ধরল দু'হাতে, বলল, কেন নিলু রায়ের মত বেশ বসে থাকতে চেয়ার নিয়ে বাইরে, লোকের সব্বোনাশ করার কথা

ভাবতে।

অতীন বলল, নিলু রায় না হতে পারলে কী করতাম শম্পা?

শম্পা বলল, আরো টাকা কীভাবে হয়, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে অতীনবাবু, ভাল করে ঘুষ নিতে।

সবাই কি তা নেয়, নেয় না শম্পা, কত ভাল লোক আছে চারপাশে, আমি তাহলে কী করতাম শম্পা?

শম্পা বলল, তুমি বাড়ি বসে টিভি সিরিয়াল দেখতে অতীনবাবু।

অতীন বলল, আমাকে কিছু দেবে?

কী দেব গো, কী দেব? বলতে বলতে দীর্ঘ এক চুমু দিল শম্পা তার স্বামীকে। অনেকদিন এসব থেমে গেছে। জীবন হয়ে গেছে খুব শ্লথ, বয়ে যেতেই চায় না। ভারবাহীর মত জীবনকে বয়ে নিয়ে চলেছে তারা। প্রতিদিন আর সবদিন একই। সেই ঘুম সেই জাগরণ। শম্পার কত আগে ঘুমিয়ে পড়ে অতীন। শম্পার কত আগে জেগে ওঠে অতীন। শম্পা বলল, ভাগ্যিস তোমার অতুলানন্দ ছিল।

অতীন শম্পার মাথার বেনি খুলে দিতে দিতে বলল, কী রূপবান ছিল সেই গায়ক!

তাই, তুমি মনে করতে পার?

খুব পারি, দিদির তখন বড় হয়ে ওঠার শুরু, দিদির খুব ইচ্ছে ছিল ওর কাছে গান শেখে, দিদি কি সত্যিই রেকর্ডটা নিয়ে যায়নি? খুলে দেওয়া চুলে আবার বেনি করতে করতে অতীন বলল, দিদি কি ভুলে গেছে সত্যি?

কেন গো, কী হয়েছিল? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

কী হয়েছে কে জানে, যেদিন রেডিওতে শোনাল সেই গান, দিদি সকাল থেকে এঘর ওঘর করে, আমার মনে আছে ফুল ফুল ঘটি হাতা ফ্রক, দিদির সব ভুল হচ্ছে, মা লক্ষ্য করেছিল, দুপুরে শুনি মা চাপা গলায় দিদিকে বলছে, কিছু বুঝিনে ভাবিস।

সেইদিন বসন্তবেলা, মন নিয়ে চুপি চুপি করেছ খেলা, কেন জানি না, কেন জানি না, গুনগুন করে উঠল শম্পা, কার গান বল দেখি?

আহা, কার গান কার গান, কার গান, কে গেয়েছিল সেইদিন বসন্ত বেলায়, দিদি এখন ভুলেই গেছে অতুলানন্দকে, এখন মহাকাল, উজ্জয়িনী, শিপ্রা নদী ব্যতীত কিছু জানে না, হাত ধোয় বারে বারে, স্নান করে তিনবার, ঠাকুর ঠাকুর করে। জীবন জীবন জীবন, তুই এমন কেন জীবন?

শিপ্রা বলে, জীবন মহাশয় বড় বিচিত্র একজন, কাকে কী দেবে কেউ জানে না।

অতীন বলল, দিদি গুনগুন করে গাইত, তুমি না বলে গিয়াছ চলিয়া, নামিছে অন্ধকার, কিন্তু তা আমার কাছে, দ্যাখ তো ভাই হচ্ছে।

তারপর?

তার আর পর নেই, অতুলানন্দ ঘুরে বেড়াত রেডিও স্টেশনে, যদি অতুলপ্রসাদ গাইতে দেয়, যদি দ্বিজেন্দ্রগীতি গাইতে দেয়, বাবার লেখা গান নিয়ে আবার যেত গ্রামোফোন কোম্পানিতে...।

তুমি কী করে জানলে?

বাবা তো বলত বাড়ি এসে, আর তাই শুনে দিদি কি আমাকে বলত– না, দ্যাখ ভাই হবে হবে, ঠিক হবে, একদিন সে খুব নাম করবে, প্রথমে এমন হয়।

তারপর? শিপ্রা তার মাথার কাঁচা-পাকা চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, ভগবান আর ভগবান, পৃথিবীতে ভগবান ছাড়া আর কিছু নেই।

ভুলেই গেল দিদি, হাত ধুতে ধুতে, স্নান করতে করতে, মন ধুয়েমুছে সাফ করে দিল।

শিপ্রা শুনতে শুনতে বলে, তুমি যে সমস্ত জীবন এইসব করে বেড়াচ্ছ, এই জন্য এই জন্য, আমি ঠাকুর ঠাকুর করি না, আমার কত বই আছে, আমার হাবির আছে অতলানন্দ.....হা হা হা, অতল আনন্দ।

বিস্মিত হল অতীন, অতলানন্দ, কে বলল তোমায় 'অতলানন্দ'?

কে বলবে, মুখে এসে গেল, আমি নিজে বললাম।

গুলাম হুসেনের মত বললে।

আমি তো গুলাম হুসেন জানি না। বলল শম্পা।

আনন্দের অতল তল! বিড়বিড় করল অতীন, হুম, বাঁচার একটা মানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, আমি একটা গাড়ি কিনে নিলু রায়ের সঙ্গে ঝামেলা পাকাতে পারতাম, এই গলিতে রাখা হবে কী হবে না, নিলু বলত, তার জামাই কিনেছে বিএমডব্লিউ, হা হা হা, আমি অফিসে প্রতিদিন পার্টি খুঁজে বেড়াতাম। আমার একটা বস আছে, তার ভীষণ অপ্রিয় আমি, মুখের কথায় কাজ করাতে পারেনি, আমি গান খুঁজে বেড়াচ্ছি।

হি হি করে হাসে চম্পা, গান খুঁজে বেড়াচ্ছ, কার গান, অতলানন্দ, আনন্দের অতল তল খুঁজছ, 'চম্পাকলি গো, কত নামে ডেকেছি তোমায়' মনে আছে মনে আছে?

আছে আছে আছে, মধুমতি যায় বয়ে যায়..., উফ, কী গাইতেন, উনি কোথায় চম্পা, আহা, চম্পা নয় শম্পা।

ইসস, চম্পা শম্পা চম্পা শম্পা, আমিই সব। বলতে বলতে শম্পা জড়িয়ে ধরে অতীনকে, বলে, রেকর্ড নিয়ে বাড়ি ফিরো বাবু অতীন্দ্র।

রাতে অনি সব শুনে বলে, ইন্টারেস্টিং, পাসিং শো সায়েব?

হ্যাঁরে অনি।

অনি বলল, আমি ফেসবুকে আমার প্রোফাইল পিকচার করব ওই লোকটার মুখ দিয়ে, টেক্সাসের কাউ বয়ের ছবি তো, পুরনো আমেরিকান ফিল্মে দেখা যেত, ক্লিন্ট ইস্টউড বা অমনি কেউ।

খাওয়ার টেবিলে বসে কথা হচ্ছিল। তারপর একটু থেমে অনি বলল, লোকটা তো দারুণ, তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল পাসিং শো সায়েবের?

তখন অনির মা শম্পা গুনগুন করে ওঠে, ময়নামতীর পথের ধারে দেখা হয়েছিল, মনে পড়ে গেল।

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়?

কী জানি, গানই ভেসে আসে, যিনি গেয়েছিলেন, তিনি তো ভাসিয়ে দিয়ে গেছেন, তারপর তা ভেসেই আছে বাতাসে, মাঝে মাঝে উড়ে আসে হেথা হোথা, এই আমাদের ঘরেও আসে, মনেও আসে।

অনি বলল, আমি একদিন যাব গুলাম হুসেনের সঙ্গে দেখা করতে।

শম্পা বলল, আমিও যাব, নাহলে তাকে ডেকে এনো, আমি রেঁধে খাওয়াব।

অমর মিত্র

অমর মিত্রের জন্ম ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট অধুনা বাংলাদেশের সাতক্ষীরার নিকটবর্তী ধূলিহর গ্রামে। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও পারিবারিক আবহে সাহিত্য তাঁর বিচরণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ২০০৬ সালে *ধ্রুবপুত্র* উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন অমর। এর আগে, *অশ্বচরিত* উপন্যাসের জন্য ২০০১ সালে পান বঙ্কিম পুরস্কার। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে, শরৎ পুরস্কার (ভাগলপুর, ২০০৪), সর্বভারতীয় কথা পুরস্কার (১৯৯৮), গজেন্দ্রকুমার মিত্র পুরস্কার (২০১০)। বর্তমানে কলকাতা শহরে বসবাসরত অমর মিত্রের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা ১৯৭৪ সালে। প্রথম উপন্যাস *নদীর মানুষ* ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় অমৃত পত্রিকায়।

হারিয়ে একটি গান *পাসিং শো*-র কেন্দ্রবিন্দু। এই উপন্যাস একটি হারিয়ে যাওয়া গান আর হারিয়ে যাওয়া রেকর্ড নিয়ে। মানুষ তার জীবনে যা হারায় তাই বুঝি ফিরিয়ে আনতে চায় এইভাবে। একটি গান রেকর্ড করে যে গায়ক মুছে গেছেন স্মৃতি থেকে, সেই গান বুঝি ফিরে আসে গভীর রাতে, বাতাসে ভেসে কিংবা স্বপ্নের ভিতরে। আশ্চর্য এই কাহিনি যেন হারিয়ে যাওয়া জীবনেরই অন্বেষণ। আর এক অজ্ঞাতপ্রায় শিল্পীর প্রতিরোধে এই উপন্যাস পেয়েছে অনন্য এক মাত্রা। *পাসিং শো* যেন প্রবহমান জীবনের অফুরন্ত এক প্রদর্শন। *পাসিং শো* কলকাতার বিখ্যাত নাটকের দল *সায়ক* নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করছে নিয়মিত।

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত অমরের *ধ্রুবপুত্র* খরাপীড়িত প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরের কাহিনি– কবি কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের এক বিপরীত নির্মাণ যেন। দীর্ঘ এই আখ্যান শেষ পর্যন্ত শূদ্র জাতির উত্থান ও কবির প্রত্যাবর্তনে পৌঁছয়।

আর বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত *অশ্বচরিত* তথাগত বুদ্ধের ঘোড়া কন্থক ও তাঁর সারথী ছন্দকের কাহিনি। লেখক ভারতীয় প্রতিবেশে জাদু বাস্তবতা ব্যবহার করেছেন এই উপন্যাসে। অনন্য ক্লাসিকধর্মী এই উপন্যাস দু'টি বাংলা উপন্যাসে এক আলাদা রীতির জন্ম দিয়েছে।

এইভাবে রাত গভীর হল। অতীন ঘুমোল। শম্পা ঘুমোল। ফেসবুকে জেগে থাকল অনি, অনিকেত বসু। তার কাছে এল ডুমুরের দীপালি মণ্ডল, ডাকল, ও ভাই ভাই, কেমন আছ, আমি অনেকদিন আসিনি।

কেন দিদি কী হয়েছিল?

তুমার দাদাবাবু গেল।

কোথায় গেল?

ভাই, কোথায় গেল আমি জানিনে, বিমল বিশ্বাস নামের একটা লোক বলল, চ জিতেন, একটা গান খুঁজে আসি।

সত্যি বলছ? অনি জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ ভাই সত্যি বলছি, সেই যে সন্ধের আগে বিকেল বিকেল গেল, তারপর আর আসে না, আমি বসেই থাকি দিনভর।

দ্যাখো, ঠিক ফিরে আসবে। অনি বলে।

তখন দীপালি বলল, নারে ভাই, সেই যে বিমল বিশ্বেস, সে যেন এল নিশির ডাকের মত, গান পাগলা তুমার দাদাবাবু, তারে গান শুনাতে কুথায় যে নিয়ে গেল।

অনি বলল, বিমল বিশ্বাস ইন্ডিয়ায় থাকে দিদি, কলকাতায়, সে তোমাদের ওখানে যাবে কী করে?

দীপালি মণ্ডল বলল, দুকুরে বাড়ি ফিরল লোকটা, সেই ভোরে সাতক্ষীরে গিয়েছিল, তারপর ভাত খেয়ে ঘুমোয় পড়ল, মেঘ উঠেছিল একটু পশ্চিমে, সেই ভৈরবের দিকে, ভাবলাম ঝড় উঠবে, ঠাণ্ডা বাতাস দিল, দূরে কুথাও ঝড় উঠেছিল, বিষ্টি, তুমাদের ইন্ডিয়ায় হতে পারে, সন্ধের আগে ধড়ফড়িয়ে উঠল লোকটা, উঠেই বলল, বিমলদা একটা গান দেবে, বিমল বিশ্বেস, ঘুরি আসি, সেই গেল, লোকটা স্বপনে আসে, তা আমারে তুমার দাদাবাবু আগে বলেছিল।

অনিকেত বলল, হ্যাঁ, সেদিন খুব ঝড় আর বৃষ্টি হল, প্রথম কাল বোশেখী, দিদি আমার ঘুম পাচ্ছে, শুভ রাত্রি, মনে হয় সেই বিমল বিশ্বাস আসছে দিদি, ভৈরব পার হয়ে, নদীটি গিয়াছে চলিয়া, নদীর পিছু পিছু সে হাঁটে গো দিদি, বাই।

পনের.

তিনদিন বাদে অতীন আবার গেল গুলাম হুসেনের ওখানে। তার মোবাইল নম্বর দিয়ে এসেছিল তো, সে বলেছিল পেলে ফোন করাবে আজিজুলকে দিয়ে। কিন্তু কোন ফোন আসেনি। অতীনের কাছে গুলাম হুসেন আর আজিজুল দু'জনের নম্বর ছিল, কিন্তু সে ফোন করেনি। মোবাইল ফোনে কথা বলা আর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো এক নয়। তাকে গুলাম হুসেন টানছিল। টানছিল এই কারণে যে অনি আবার এক অদ্ভুত কথা শুনিয়েছে বিমল বিশ্বাসকে নিয়ে। ফেসবুক আর স্বপ্ন তার মিলে মিশে যাচ্ছে।

দুই জগৎই তো ভারচুয়াল। ধরা যায় না। দীপালি মণ্ডলের সঙ্গে কি দেখা হবে কোনদিন অনির?

খুলনা জেলা না সাতক্ষীরে জেলার কোন অন্তঞ্চগ্রামে থাকে তারা। একটা মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট রিচার্জ করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু তার কথা যদি সত্য হয়, তাহলে তো স্বপ্ন আর বাস্তবে কোন ফারাক থাকছে না। নেই নেই নেই। জীবন আসলে এই রকম। এই রকম জীবনকে দেখা যায় না। কিন্তু তা বলে তা নেই নাকি? মিলে যাচ্ছে তো অনেক কিছু। বিমল শেষ এল সেই কাল বোশেখীর দুপুরে। তারপর কি সে ডুমুরের দীপালি মণ্ডলের স্বামী পরীক্ষিৎ মণ্ডলের সঙ্গে বেরিয়েছে গান খুঁজে নিতে? নদীটি গিয়াছে চলিয়া...। এই সমস্ত ভাবতে ভাবতে অতীন গেল গুলাম হুসেনের কাছে।

আজিজুলের দোকান আজ বন্ধ। জুম্মাবার কি না। কিন্তু গুলাম হুসেন বন্ধ রাখে না কোনদিনও। এখানে না এলে তার তবিয়ৎ ঠিক থাকে না। ঘুম হয় না। সে ঝিমোচ্ছিল বসে। আর লং প্লেয়িং রেকর্ডে বাজছিল শচীন দেববর্মণ। খুব আস্তে আস্তে। অতীন তাকে ডাক দিল, গুলামভাই।

যেন ধড়ফড়িয়ে ওঠে মানুষটা, আইয়ে সাব, আইয়ে, হামি তো আপনার জন্য বসে আছি, লোক লাগানো হয়ে গেছে, অনলি ওয়ান সেভেন্টি এইট রেকর্ড, অতলানন্দ রায়, নদীটি গিয়াছে চলিয়া..., পাসিং শো, হাঁ সাব, পাসিং শো, উ পাসিং শো সায়েবের খোঁজ মিলেছে, এবার সব হয়ে যাবে।

সে সিগারেট, আছে এখনো?

গুলাম হুসেন বলল, আছে, সব কুছু আছে সাব, কুছ ভি ফুরায় যায় না, সব কুছু রহি যায়, হামি সেভেন্টি আপ, ঝুটা বলব না বাবু, কী হবে ঝুটা বলে, উপরলা সব দেখছে বাবু, আর না দেখলেও খবর হয়ে যাবে।

ঠিক আছে গুলামভাই, ঠিকাছে, পাসিং শো না রেকর্ড, কোনটা মিলেছে?

গুলাম হুসেন বলল, একটা হলে আর একটা হবে স্যার, শুনিয়ে সাব, ক্যা হুয়া, কী হল কাল, হামার ই সময়, মানে ই বিকাল আর সঞ্ঝে, সাঁঝবেলায় একটু নিদনিদ ভাব লেগে গেল কাল, আজও তাই হচ্ছে, কেমন হাওয়া উঠেছে দেখছেন সাব, খতরনাক বাতাস, বডির ভিতর ঢুকে যাচ্ছে যেন, এমন এক একটা ঝাপ্টা মারছে না সাব, মনে হচ্ছে আগের জন্মের কথা মনে পড়ে যাবে, হান্ড্রেড ইয়ারস আগে থেকে ছুটে আসছে।

বাহ্, কী অদ্ভুত বলছে গুলাম হুসেন। অতীন মুগ্ধের মত তাকিয়ে আছে বুড়োর দিকে। দেখে মনে হচ্ছে, ডি এল রায়ের শাজাহান নাটকের দুঃখী সম্রাট। সেই ডি এল রায়ের আমল থেকে সে বেঁচে আছে। বলছে, সাঁঝবেলায় হাওয়া উঠল, ঝাপটা মারল, ঘোর লাগছে হামার, মনে হল নিদ এসে যাবে, তো সেই লোকটা, সেই সময় এল ট্রাম লাইন পার হয়ে, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, গায়ে একটা মিল্ট্রি ওভার কোট, ভাঙা মুখ, হামি তো চিনে নিয়েছি, ঝানসির কিল্লায় দেখেছিলাম, পুরা ছ'ফুট হাইট হবে, পাসিং শোর সাহাব, হামাকে পুছল, হেই ওল্ড ম্যান, ম্যাকারথি লেন কাঁহা?

হিন্দি বলল? জিজ্ঞেস করে অতীন। সে বসে পড়েছে গুলাম হুসেনের সামনে রাখা একটি টুল-এ। গুলাম হুসেন তার কথা শুনে বলল, হিন্দি না ইংলিশ, না বাংলা, হামি বলতে পারব না সাব, লেকিন সে হামাকে পুছল, মেকাথি লেন কাঁহা?

মানে, ম্যাকারথি লেন?

হাঁ সাব। গুলাম হুসেন বলল।

কোথায় ম্যাকারথি লেন?

সাব, সে বলল মেকাথি লেন যাবে, সে জন মেকাথির নাতির নাতি আছে, আউর উসকো নাম ভি জন মেকাথি আছে...।

কোথায় সে রাস্তা? জিজ্ঞেস করে অতীন।

পাতা নেহি সাব, উ আদমি যেন হামার জন্মের আগের কথা বলছে, হামি ও রাস্তা জানি না শুনে, হামি যখন বললাম, আই ডোন নো, সে এমন ভাবে তাকাল সাব, মনে হল পুরা পাসিং শো, পাকিটে যে সাহাব থাকত, সে।

তুমি পাসিং শো দেখেছ?

ইয়েস স্যার, মায় ফেভরিট সিগ্রেট, পুরা মনে আছে সাব।

জাহাজি লোক?

হতে পারে, নাও হতে পারে, টুরিস হতে পারে, হাওয়াই জাহাজে নেমেছে জন মেকাথি লেন দেখতে, লেকিন আকেলা আদমি, জুড়ি মেমসাব নেই, সে হামাকে তখন বলল, ক্যানিং ডক যাবে, কী মুশকিল বলুন দেখি, ক্যানিং ডক কাঁহা মিলেগা সাব?

অতীন মনে মনে বলল, বিমল বিশ্বাসের সামনে বসে আছি নাকি আমি? গুলাম হুসেনের কাছে পাসিং শোর সায়েব এসেছিল, না সেই ডুমুরের দীপালি মণ্ডলের স্বামী পরীক্ষিৎ মণ্ডল? স্বপ্নের ভিতরে গানের কথা শুনে ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়ে পড়েছে। অতীন চমকে ওঠে, তারও তো তাই হয়েছে।

স্বপ্নের ভিতরেই যেন ঘুরে এসেছে নদীটি গিয়াছে চলিয়া...। সে ঘোরের ভিতর পড়ে গেছে যেন।

জিজ্ঞেস করে, ক্যানিং ডক নেই গুলাম ভাই?

কী করে থাকবে সাব, নদী শুখা হয়ে গেল, রিভার মাতলা, পুরা চর, মিট্টি-কাদা, ভাটার সময় পানি সব টেনে নেয় সমুন্দুর, ডক ফুটে গেছে, শুধু পাবলিক বলে, ডকের ঘাট, আর এখন তো ব্রিজ হয়ে গেছে মাতলার উপর, পারাপারের নাও ভি নাই, তো কী হল, সে মি. পাসিং শো হামাকে বলল, এ হুসেন ভাই, এক পানসি কনট্যাক করে দাও, সে নাকি পানসি করে ক্যানিং ডক যাবে, কী আদমি বলুন।

তবে সে কী করে যাবে, জন ম্যাকারথি? অতীন জিজ্ঞেস করে।

কিঁউ সাব, হামি বললাম শিয়ালদা থেকে ক্যানিং লোকাল ধরে ক্যানিং

চলে যেতে, সে বলল, ঝুটা বাত, আরু লাইং, মানে হামি কি ঝুটা বলছি, পানসি চাহিয়ে, পানসি কাঁহা মিলেগা বোলো।

তারপর? দম যেন বন্ধ হয়ে আসে অতীনের, কী অবাক করা রূপকথা শোনাচ্ছে গুলাম হুসেন। সে বলছে, পাসিং শো সায়েব তখন জিজ্ঞেস করে, বাগবাজার কাঁহা?

কিঁউ সাব?

বাগবাজারের এক ক্যানেল আছে, ওই ক্যানেল বিদ্যাধরী রিভারে পড়েছে, ওই রিভার ধরে ক্যানিং পোর্ট যাবে সে, গ্রেন্ড ফাদার জন মেকাথি তাই বলে দিয়েছিল।

এই আশ্চর্য আলাপন শুনতে শুনতে অতীন বলল, সেই ক্যানেলে তো নৌকো চলে না গুলাম ভাই।

হাঁ, হামি তো জানি সাব, ক্যানেলে পানি নাই, রিভার গঙ্গায় পানি নাই তো ক্যানেল কী করে পানি পাবে, হামার এখানে পুরানো রিকড খুঁজতে আসত এক বাবু, কপিলবাবু, তো উনি বলত, ফারাক্কায় যে ড্যাম হয়েছে, তা সব নদী শুখা করে দিয়েছে, বাংলাদেশের বড় বড় রিভারে পানি নাই, আর ইন্ডিয়ায় ইউ পি বিহারে পানি সব লুট করে নেয় নাকি, ফলে গঙ্গায় পানি আরো কম, ক্যানেলে পানি কম, বিদ্যাধরী রিভারে পানি নাই, শুখা, কী হালত হল জগতের।

কপিলবাবু কে? কপিল ভট্চায, নদী বিশেষজ্ঞ ? না হলে আর কোন কপিলবাবু আছে যে এইসব বলবে গুলাম হুসেনের কাছে রেকর্ড কিনতে এসে? কী অদ্ভুত যোগাযোগ? কপিল ভট্টাচার্য কি অতুলানন্দের রেকর্ড খুঁজতেই আসতেন গুলাম হুসেনের কাছে? নদীটি গিয়াছে চলিয়া..., পথ পড়ে আছে ধূলায়। থরথর করে কেঁপে ওঠে অতীন। বাতাসের ঝাপটায় সে টলে গেল প্রায়। এখন সন্ধের ওয়েলিংটন স্কোয়ার জমজম করছে মানুষজনে। বাসের কন্ডাক্টর হাঁকছে শিয়ালদা, শ্যামবাজার, ডানলপ, বেলঘরিয়া... তার ভিতরে গুলাম হুসেন বলে যাচ্ছে যাঁর কথা সেই মানুষটিও একশো পার হয়ে গেছেন অনেকদিন। কপিল ভট্টাচার্যের বই পড়েছে অতীন। কপিল ভট্টাচার্যের এক বক্তৃতা শুনেছিল সে বোধহয় বছর তিরিশ আগে। তখন সে যুবক। তিনি প্রবীণ। মনে আছে, তিনি বোঝাচ্ছিলেন, বাংলার ইতিহাস তার নদীর খাত ধরে চলমান হয়েছে চিরকাল। বাংলার নদীই বাংলার প্রাণ। সেই নদীতে জনজীবনেরই অধিকার। কিন্তু সেই অধিকার কীভাবে কেড়ে নিতে যাচ্ছে কর্পোরেট হাউস, তা বুঝিয়েছিলেন তিনি। পরে তাঁর লেখায় পড়েছে, নদীতে নদীতে সংযোগের যে পরিকল্পনা নিতে যাচ্ছে সরকার তা কত ভয়ানক। মনে পড়ল অতীনের, তিনি নদীর মৃত্যুর কারণ খুঁজে বেড়াতেন। নদীর ধারে শ্মশান, শ্মশানের ভিতরে নদী। অন্ত্যেষ্টি চলছেই। কপিলবাবু এসে অতুলানন্দ রায়কেই হয়তো খুঁজে গেছেন এখানে। নদী নিয়ে যত গান তা সংগ্রহ করে বেড়াতেন নাকি কপিলবাবু? সে জিজ্ঞেস করল, কপিলবাবু তো নেই।

না, শুনেছি তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেছে বহুত দিন। বলল গুলাম হুসেন।

তো পাসিং শো সায়েব কী করল?

দেখিয়ে স্যার, উ জন ম্যাকারথি, মানে এই সায়েবের গ্রান্ড ফাদার বলেছিল নাকি কলকাতায় এসে গুলাম হুসেনের সাথে কন্ট্যাক করতে, গুলাম হুসেন তাকে পানসি দেবে, তো লোকটা হামাকে বলল, গুলাম হুসেনকো বুলাও, উ পানসি দিবে, উ আদমিকা পানসি চাহিয়ে, হামি পুরা বুঝালাম, কেনেলে পানি নাই, একবার গরমেন্ট খুব চেষ্টা করল লঞ্চ চালাতে, পারল না, লঞ্চ কাদায় আটকে গেল, লেকিন সে বিশোয়াস করে না, বলে কাঁহা হায় গুলাম হুসেন জাহাজিয়া, সেইলর।

অতীন বলল, তুমি তো রিকডিয়া, জাহাজিয়া না, তুমি কোথায় পানসি পাবে?

গুলাম হুসেন বলল, উ পাসিং শো মিকাথি কিন্তু ভুল বলেনি সাব, হামার ফেমিলি তো সেইলরের ফেমিলি, হামার দাদা, তার আব্বু, গ্রান্ড গ্রান্ড ফাদার ছিল সেইলর, উ সেইলর খিদিরপুরে সিটেল হল কত বছর আগে..., হামি তো সেইলরই হতাম...।

গুলাম হুসেন বকবক করে যাচ্ছে, কিন্তু অতীনের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সেইলর কাশীনাথ। বিমলের ছোটভাই কাশী, সিলেটের মেয়ে বিয়ে করেছে, সিলেট থেকে ফিরল কি? সিলেটের মানুষই নাকি মাঝি-মাল্লা হত বেশি, ছিপখান তিন দাঁড়, তিনজন মাল্লা, কাশী, গুলাম হুসেন আর পাসিং শো সাহেব।

গুলাম হুসেন বলছে, হামার ফেমিলি তো সেইলরের ফেমিলি, তা বিলেতের লোক ভি জানে, হামি সেইলর না হয়ে রিকডিয়া, লেকিন হামি তো সমুদ্দুরের স্বপ্ন দেখি, রিভারের স্বপ্ন দেখি, অতলানন্দের গান হামার মাথায় ঘুষে গেছে সাব, মনে হয় ওই গান হামি স্বপ্নের ভিতর শুনেছি।

একেবারে বিমল বিশ্বাস। অতীন গুনগুন করতে থাকে, নদীটি গিয়াছে চলিয়া...। গুলাম হুসেন বলে, পাসিং শো সাব ক্যানিং ডক চলে গেছে স্যার, ডক ক্যানিঙে কোনদিন জাহাজ ঢুকল না, তার আগে নদী মরে গেল, আপনি ক্যানিং গেলে পাসিং শো সাবকে পেয়ে যাবেন।

অতীন পাসিং শো নিয়ে বাড়ি ফিরল। সেই গন্ধ তাকে ঘিরে রেখেছে যেন।

• পরবর্তী সংখ্যায়

অমর মিত্র
সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় লেখক

বাংলাদেশ-ভারত
মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd, b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

নিবন্ধ

সলিল চৌধুরী
ও আমাদের প্রজন্ম

পরাগবরণ পাল

সলিল চৌধুরী যে কত বড় সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব ছিলেন তা নিয়ে নতুন কোন আলোচনা ফাঁদতে আমি বসিনি, সে আলোচনা করার যোগ্যতাও হয়তো আমার নেই। এসব বহুচর্চিত বিষয়; আরো অনেক অনেক চর্চার ক্ষেত্র এখনো পড়ে আছে। আমার আলোচ্য বিষয় হল– আমাদের সমসাময়িক প্রজন্মের যারা একটু গান-বাজনা বা সাহিত্য-সংস্কৃতি পছন্দ করি, সেই রকম সমমনস্ক কয়েকজনকে উনি কি-করে এক্কেবারে পেড়ে ফেললেন– সেটাই। এখানে আমাদের প্রজন্ম বলতে তাদের বোঝাচ্ছি– যাদের এখন পঞ্চাশ প্লাস-মাইনাস দশের মধ্যে বয়স। সত্তর দশকের একদম শেষ দিক থেকে নব্বই দশকের শুরুর দিকের মধ্যে কোন না কোন সময়ে যাদের কলেজ-জীবন কেটেছে। এদের বেছে নেওয়ার কারণ– এদের যে-সময়টায় সঙ্গীতবোধ তৈরি হয়েছে, সে-সময়ে এরা পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর

‘পাল্কির গান’, ‘রানার’, ‘অবাক পৃথিবী’, ‘ঠিকানা’, ‘উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা’ ইত্যাদি কবিতায় সুরারোপ, বা হেমন্ত-লতা-সবিতা ইত্যাদির গলায় অনেক অনেক গান শুনে একটা বিষয় নিশ্চিত হলাম যে সলিল চৌধুরী একদম সবার থেকে আলাদা একটা ব্যাপার।

দশকের বাংলা-হিন্দি গান যেমন শুনেছে, তেমনি সলিল চৌধুরীর থেকেও প্রতি বছর নতুন কিছু না কিছু পেয়েছে। কারণ আশির দশকেও সলিলবাবু রীতিমত সক্রিয়ভাবে গান বানাচ্ছেন। ‘আমরা’, ‘একটু চুপ করে শোনো’, ‘ঘুম ভাঙার গান’ ইত্যাদি অ্যালবামের পাশাপাশি হেমন্ত-লতা-বনশ্রী-হৈমন্তী-অরুন্ধতী-সবিতা-অন্তরা ইত্যাদির গলাতেও আমরা তাঁর নতুন নতুন কম্পোজিশন শুনছি এই সময়টা জুড়ে। কিন্তু আমরা কেউই তাকে মাঠে-ঘাটে বা অনুষ্ঠানে গণসঙ্গীতে দাপিয়ে বেড়াতে বা কয়্যার পরিচালনা করতে দেখিনি। আমাদের বাবা-কাকারা এবং তাদের একটা বিরাট অংশ এই অসম্ভব প্রতিভাবান ভদ্রলোকের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বে ছিলেন একেবারে আচ্ছন্ন। আমরা তাঁকে সেভাবে না-দেখেও, শুধু শুনে, তাঁর কর্মকাণ্ডে এত আপ্লুত হয়ে গেলাম কি করে?

কিন্তু না, একটু প্রেক্ষাপটটা বলে নিই। অর্থাৎ আরো একটু পেছনে হাঁটি। আমাদের ছোটবেলা মানেই বছর বছর পুজোর নতুন গান, এইচএমভি প্রকাশিত ‘শারদ অর্ঘ্যতে’ সেইসব গানের বাণী বা গীতিকার-সুরকারদের নাম জানা, রেডিওতে ‘অনুরোধের আসর’-এ আধুনিক গান শোনা ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রচুর নতুন নতুন গান শোনা যেত, তার মধ্যে পুরনো কিছু গান বার বার ঘুরে ফিরে আসত। একটা সময় আমরা মানে, আবার সেই প্রজন্মের কথায় এবার ফিরে আসছি, যখন থেকে গায়ক ছাড়াও গীতিকার-সুরকারদের নাম আলাদা খেয়াল করতে শুরু করলাম, তখন আবিষ্কার করলাম যে, যে গানগুলো বছর বছর ধরে আমাদের একইভাবে নাড়িয়ে দিচ্ছে– তার অনেকগুলোই সলিল চৌধুরীর বানানো বা সুর-করা, অধিকাংশই কানে শুনতে একেবারেই মসৃণ, কিন্তু যখন হারমোনিয়াম নিয়ে গাইতে বসছি তখন ‘পথে এবার নামো সাথী’ গাইতে গিয়ে বা ‘পাল্কির গান’, ‘রানার’ বাজাতে গিয়ে পুরো কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। গান তো একটা স্কেলে শুরু হয়, সেই স্কেলেই সাধারণত পুরোটা হয়। কিন্তু এ তো দেখছি এই মুহূর্তে এই তো পরের মুহূর্তে ঐ। কাছাকাছি সময়ে পাল্কি বা রানার মূল কবিতাগুলো পড়লাম সত্যেন্দ্রনাথ বা সুকান্ত সমগ্রতে। ঐ বয়সে সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যজনক লাগল সেটা হল পাল্কির কবিতাটায় ঐ ‘হুম হুনা’ ব্যাপারটি নেই। কবিতাটা হল পাল্কিতে চড়ে একজন যাচ্ছে– তার চোখে গ্রাম বাংলার রূপ। গানটাও তাই। পাল্কিতে বসা লোকটিই যেন সব কিছু দেখছে আর গাইছে। কিন্তু শুধু ঐ ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো যোগ করায় পাল্কির বেহারারাও এখানে সমান্তরাল চরিত্র। তারা যখন দিনের শুরুতে পূর্ণ উদ্যমে চলে তখন ‘হুম হু না’-ও চলে দ্রুততালে। বেলা গড়িয়ে দুপুর হলে তাদের ঈষৎ ক্লান্ত পা একটু দুলকি চাল ধরে– ঐ ‘হেঁইয়া রে হেঁইয়া, হেঁই সামালো হেঁইয়া, হেই সামাল... সামাল হেঁকে চলল ডেকে’– ঐ জায়গাটায়। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঢোকার সময় ‘আহা ঐ গায়ের ঐ সীমানা’ বলে ‘আ’ টান দিয়ে যেখানে এসে গানের পর্দা আবার থিতু হয় সেটা সম্পূর্ণ অন্য একটা স্কেল। এ-গ্রাম ছাড়িয়ে ও-গ্রামে ঢুকল, যেন নাটকের মত দৃশান্তর বা দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটল, অতএব এক নতুন সুরে গানের আবার যাত্রা শুরু হল। গোটা গানে কথার সঙ্গে সুর এমন মিলমিশ খেয়ে চলছে যে বোঝাই যায় না এটা একটা কবিতার উপর সুরারোপ! ‘উঠছে আলে’– তো সুরও একটু উঠল; ‘নামছে গাড়ায়’ তো সুরও একটু নামল; ‘পাল্কি দোলে ঢেউয়ের নাড়ায়’তে সুরেও সেই ঢেউয়ের দোলা! ‘উড়ছে মাছি ভনভনিয়ে’তে হঠাৎ অচমকা দুটো পাশাপাশি পর্দা এমন দুর্দান্ত লাগল যে মাছির ভনভন আওয়াজটা কানে শোনা গেল! দিনের (এবং গানের) শেষে বেহারাদের মুখের ঐ ‘হেঁইয়া হেই রে হেঁইয়া হা’তে যেন সারাদিনের পথশ্রমের ক্লান্তি। একদম শেষের এই ছন্দপরিবর্তনটি সত্যেন দত্তের কবিতাতেও আছে, কিন্তু মাঝের সবকিছু একেবারেই সলিল চৌধুরীর নিজস্ব সংযোজন।

এই ‘পাল্কির গান’, ‘রানার’, ‘অবাক পৃথিবী’, ‘ঠিকানা’, ‘উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা’ ইত্যাদি কবিতায় সুরারোপ, বা হেমন্ত-লতা-সবিতা ইত্যাদির গলায় অনেক অনেক গান শুনে একটা বিষয় নিশ্চিত হলাম যে সলিল চৌধুরী একদম সবার থেকে আলাদা একটা ব্যাপার। এখানে পাশাপাশি এটাও বলে রাখা উচিত শুধু সুরকার হিসেবে নচিকেতা ঘোষ, সুধীন দাশগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রাহুল দেববর্মণ– বা আরও অনেককেই অনেক সময় জিনিয়াস বলে মনে হয়েছে আমাদের। এদের যে কোন একজনকে নিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়, এমনকি সুরকার নচিকেতা ঘোষ বা রাহুল দেববর্মণকে নিয়ে হয়তো গোটা একটা জীবনও কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু গীতিকার-সুরকার সলিল চৌধুরী যে গভীর ছাপ সেই বয়সে ফেলেছিলেন তা পাওয়া দুষ্কর! (রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল– এই দুই গীতিকার ও সুরকারকে বাইরে রেখে বলছি)

আমার স্কুলজীবনের শেষের দিকে সলিল চৌধুরীর কথায় ও সুরে একটি লং-প্লেইং রেকর্ড প্রকাশিত হয়– ‘ঘুম ভাঙার গান’। বলে রাখা ভাল যে আমার বাবা-কাকার মুখে, অথবা ছোটবেলায় মান্না দে-সবিতা চৌধুরীর গলায় এর অনেক গানই ছিল আমার আগে শোনা। যেমন ‘ঢেউ উঠেছে কারা টুটছে’, ‘হেই সামালো’, ‘আমাদের নানান মতে’, ‘মানব না এ বন্ধনে’, ‘ও আলোর পথ যাত্রী’ ইত্যাদি। দেবব্রত বিশ্বাসের গলায় শোনা ছিল ‘আমার প্রতিবাদের ভাষা’, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলায় শোনা ‘আয়রে ও আয়রে’। কিন্তু সলিল চৌধুরীর পরিচালনায় নতুনভাবে নতুন যন্ত্রানুষঙ্গে আমি যেন নতুন করে শুনলাম এই গানগুলো। ‘ও মোদের দেশবাসীরে’ আর ‘গৌরীশৃঙ্গ তুলেছে শির’ আমি আগে শুনিনি। গানের কথা, কোন্ পটভূমিকায় সে-সব কথা উঠে এসেছে, সুর, ছন্দোবিভাগ, তালের তারতম্য, অ্যারেঞ্জমেন্ট– সব মিলিয়ে, কি বলব একেবারে বোল্ড আউট হয়ে গেলাম। সত্যি বলতে কি, অল্প কিছু জায়গায়, বিশেষত খাদের দিকে, কোরাসের গাওয়ার খামতি একটু কানে বেজেছিল, কিন্তু এই প্রথম অনুভব করলাম যে, গান যদি দারুণ জোরালো হয়– তাহলে আর কিচ্ছুটি লাগে না।

আগে শোনা সলিল চৌধুরীর অনেক গানের কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে শুরু করলাম। এই সময় থেকে। কি সব কথা! ‘আমি ঝড়ের কাছে রেখে দিলাম আমার ঠিকানা’, ভাবা যায়! ‘পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি, সোজা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি।’ ভাবুন তো, ‘লাজে লাজানো’-র পর নামধাতুর কি সার্থক প্রয়োগ এই ‘ধেঁধেছি’ কথাটায়! পাশাপাশি রোম্যান্টিক গান দেখুন! ‘মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে গেছে/ যার চোখ তাকে আর মনে পড়ে না/...আর কোন চোখ আর মনে ধরে না’। রোম্যান্টিসিজম্ কাকে বলে কেউ যদি বুঝতে না পারে তাকে এই লাইনগুলো বলে দেখতে পারেন। এই গানেরই শেষে আরও কিছু লাইন আছে– ‘শিকলে বাঁধিতে তারে চেয়েছিনু বুঝি, শিকল চরণে তার হয়েছে নূপুর।’

পরবর্তী সময় অনেককে বলতে শুনেছি– গান লেখার ক্ষেত্রে সবসময় সলিল চৌধুরী তার লেখায় গুরুচণ্ডালি দোষ (অর্থাৎ সাধু ও চলতি ভাষার মিশ্রণ, যা থাকলে পরীক্ষার খাতায় নম্বর কেটে নেওয়া হয়) আছে... ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে এ-ব্যাপারে সবিনয়ে নিজের মতটুকু জানাচ্ছি।

কবিতা বা গদ্যের থেকে গানের ভাষা বোধহয় একটু আলাদা। এটা তো আর দেখা বা পড়ার জিনিস নয়, শোনার জিনিস। তাই কানে শোনার সময়

উনি বলছিলেন– এতরকম কাজ করা বাকি রয়ে গেল, ওঁর মৃত্যুর পর বাকিরা যদি এই করে তাই করে...। আজ ফিরে তাকালে, ঐ মৃত্যুর পর নিয়ে উনি একটা গানে যা বলে গেছেন সেটা বারবার মনে পড়ে। 'ধরণীর পথে পথে ধূলি হয়ে রয়ে যাব এই কামনা, আর কিছু না। আগামীর পায়ে পায়ে আমিও পৌঁছে যাব সেই ঠিকানায়, আর কিছু না'।

যেন ধাক্কা না লাগে, কথাকে সেরকম একটু মসৃণ করে নেবার দরকার হয় মাঝে মাঝে। তাতে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা ঠিক ঐ রকম পরীক্ষকের মত খুঁতখুঁতে মন দিয়ে দেখলে চলে না। গুরুচণ্ডালির উদাহরণ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানেও খুব কম নয়! যেমন 'সখী ভাবনা কাহারে বলে' বলে শুরু হয়ে 'সখী ভালবাসা কারে কয়' (প্রায় বাঙালভাষার কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন)। কিন্তু এ-ও কবিত্বে, বা, বলা ভাল, গীতিময়তায় উত্তীর্ণ। সলিলবাবুর 'যাক যা গেছে তা যাক' গানটি শুনুন না! কথা-সুরে এত খাপে খাপে বসে গেছে যে এটা চলতি ওটা সাধু এইসব প্রশ্ন ছিদ্রান্বেষী না হলে তোলা সম্ভব নয়। আর তার সঙ্গে অসাধারণ কাব্যময় এক্সপ্রেশন! কবির প্রেয়সী নদীতে স্নান করতে নেমেছে, তার বর্ণনা হল– 'তার তনুর তিরথে (অর্থাৎ তীর্থে) ডুবিয়া মরিতে নদীও উতলা হত/ তার ঢেউয়ে ঢেউয়ে আরও দুটি ঢেউ যেখানে দিত সে বাড়িয়ে/ সেখানে আমার উতল হৃদয় গিয়েছে হারিয়ে।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন! আমার চতুর্পাশে সবকিছু যায় আসে, আমি শুধু তুষারিত গতিহীন ধারা'– ওঁর আর-একটি গানের শেষ লাইন। মাস্টারমশাইরা বলবেন– 'চতুষ্পার্শ্ব' হয়, 'চারপাশ' হয়; কিন্তু 'চতুর্পাশ'টা গুরুচণ্ডালি কেস্। আবার সবিনয়ে জানাই– গুরু এবং চণ্ডালি দুটিই অসাধারণ আত্মস্থ করে হজম না করলে এইরকম দুর্দান্ত ঢেঁকুরবিহীন coinage অসম্ভব।

তেমনি সুর,তেমনি যন্ত্রানুষঙ্গ। কত উদাহরণ দেব? 'কেন কিছু কথা বল না' গানটির প্রিল্যুড একবার বাজানোর চেষ্টা করে দেখুন না! কোথায় শুরু হয়ে কোথায় কোথায় ঘুরে এসে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসছে– দেখতে পাবেন। 'সাত ভাই চম্পা' গানটি তো সবাই প্রিল্যুড ইন্টারল্যুড শুদ্ধই মনে রাখে– গানের সঙ্গে বাজনা এমন মিশে গেছে। চলন এতই ঝরঝরে যে অন্তরার স্কেল পাল্টে যাবার মত (যাকে পরিভাষায় tonic change বলে) একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেউ খেয়ালই করে না। সাত ভাই চম্পার জেগে ওঠার জন্য পারুল বোনের অনন্ত প্রতীক্ষার প্রতীক হয়ে আকাশের স্থির একটি তারার মত মুখড়ায় বাঁশির সুরটির দাঁড়িয়ে থাকা– অপূর্ব! শুধু বাজানোর জন্য বাজানো নয়, ওঁর যন্ত্রানুষঙ্গ সব সময়েই যেন কিছু কথা বলত, 'ও প্রজাপতি পাখনা মেলো' গানের বাজনায় যেন প্রজাপতিটিকে উড়তে দেখা যায়। 'কি যে করি' গানটির ইন্টারল্যুড যেন দমবন্ধ করা এক দোটানার অনুরণন! 'ও ঝর ঝর ঝরনা'তে পাথরের ধাক্কা খেতে খেতে ঝরনার পথ চলা যেন ঘটে চলে চোখের সামনে। 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা'র প্রিল্যুডও যেন দিশাহারা! 'শোনো কোনো একদিন' নিয়ে কিছু বলতে শুরু করলাম না, কারণ থামতে পারব না। ভৈরবী রাগে এক কম্পোজিশন আছে দুনিয়ায়, কিন্তু 'ওগো আর কিছু তো নাই'-এর মত প্রথা-বহির্ভূত ভৈরবীর প্রয়োগ একেবারে ইউনিক! জ্যাজ বা ব্লুজ কতটা গুলে খেলে 'এই রোকো' বা 'আরো দূরে যেতে হবে' বানানো যায়?

অসম্ভব মুগ্ধতার রেশ নিয়ে আমি এবং আমার কলেজজীবনের দুই অভিন্নহৃদয় বন্ধু– অভিজিৎ ও অতলান্ত একদিন সকালে ওঁর বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলাম। সালটা ৯১ থেকে ৯৩-এর মধ্যে কিছু একটা। তখন এত ফোন-টোন করে যাওয়ার রেওয়াজ চালু হয়নি, এমনিই যাওয়া যেত। নিজেই দরজা খুলেছিলেন। কলেজের একটা অনুষ্ঠানে ওঁর উপস্থিতি চাইতে এসেছি– জানালাম। বললেন ওঁর স্ত্রী-কন্যা প্রবাসে গেছেন এবং যে-দিনটায় আমাদের অনুষ্ঠান সেদিন ওর হবে না অন্য কি-একটা আছে। তারপর হঠাৎ বললেন– 'আমার কয়েকজন মিউজিশিয়ান আসবে ঘণ্টাদেড়েক পর... তোমাদের কি সময় আছে? তাহলে একটু গল্প করতাম।' আমাদের তো মোটামুটি হাতে আকাশের চাঁদ পাওয়ার মত অবস্থা। সেই কথোপকথন গড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। আজও জীবনের অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়ে গেছে সেই মুহূর্তগুলো। কী অসম্ভব স্বচ্ছ খোলা একটি মন যে বেরিয়ে এসেছিল সেদিন কথাবার্তায়! আমরা স্কুলজীবনে ইডেন গার্ডেন্সে যুব উৎসবে ওঁর ও ওঁর দলের গান শোনার গায়ে-কাঁটা-দেওয়া অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলাম। আবার এও বলেছিলাম যে তার বছর দশেক আগে একটি সাপ্তাহিকে ধারাবাহিকভাবে লেখা ওঁর আত্মজীবনী কেমন যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছিল। উনিও অনেক গল্প করেছিলেন। একটা খুব মনে আছে– ট্রেনে যেতে যেতে নতুন বানানো গান বাকিদের তুলিয়ে দিয়ে সভায় গিয়ে সেই গান গাওয়ার গল্প (পরে তৎকালীন গণনাট্য শিল্পী সীমা দাসের মুখে সে-গল্প আরো বিস্তারিতভাবে শুনেছি)। এইসব প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে ওঁর বিভিন্ন গান নিয়ে একটু-আধটু কাটাছেঁড়া, কর্ড স্ট্রাকচার নিয়ে ছোটখাটো বিশ্লেষণ– শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল এই আলাপচারিতা যেন শেষ না হয়!

আরো একটি প্রসঙ্গ সেদিন উঠে আসছিল বারবার। মৃত্যুর প্রসঙ্গ। উনি মাঝেমাঝেই বলছিলেন– এতরকম কাজ করা বাকি রয়ে গেল, ওঁর মৃত্যুর পর বাকিরা যদি এই করে তাই করে ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনরকম হতাশা বা বিষাদ থেকে বলছিলেন না কিন্তু, খুব সোজাসাপ্টা প্র্যাকটিক্যালভাবেই বলছিলেন। আজ ফিরে তাকালে, ঐ মৃত্যুর পর নিয়ে উনি একটা গানে যা বলে গেছেন সেটা বারবার মনে পড়ে। 'ধরণীর পথে পথে ধূলি হয়ে রয়ে যাব এই কামনা, আর কিছু না। আগামীর পায়ে পায়ে আমিও পৌঁছে যাব সেই ঠিকানায়, আর কিছু না'।

বিশ্বাস করুন– গায়ে কাঁটা দেয়! এক অসাধারণ গীতিকবিতার মুখোমুখি খুব কমই দাঁড়িয়েছি এ-জীবনে। রাস্তার ধূলো হয়ে যেন পড়ে থাকতে পারি, যাতে আগামীদিনের পথিকের পায়ের তলায় লেগে আমি সেই ঠিকানায় পৌঁছে যাই– যেখানে যেতে চেয়েছি আজীবন!

'কত গান কত আশা কত ছিল ভালবাসা
মগ্ন স্বপন
এ-পথেরই দুই ধারে বীজের মতন তারে
করেছি বপন
পথিক যখন যাবে, তরু-শাখা-পল্লবে
কিছু ছায়া হয়ে রবে মোর সাধনা।'

সারাজীবন তিল-তিল করে যে-সৃষ্টি করলাম, তা রইল রাস্তার ধারে তোমার জন্য গাছের সারি হয়ে, হে আগামীদিনের পথিক! চলতে চলতে ক্লান্ত হলে তার ছায়ায় একটু জিরিয়ে নিও!

এরপর শেষ স্তবক, চলতে চলতে কখনো কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমিও। থেমে গেছি। পারিনি যেতে– যেখানে যাওয়ার ছিল। আমার সেই না-পারার বেদনাকে মশাল করে জ্বালিয়ে নিয়ে তোমার পথ আলোকিত করে নিও। তারপর তোমার চলার পথে তুমি এগিয়ে যেও– হে আগামীদিনের পথিক!

'জনমলগনভরে পতাকার মত করে
নিয়ে ইতিহাস
যেতে যেতে ক্রমে ক্রমে কখন গিয়েছি থেমে
ভেঙে গেছে শ্বাস।
তুমি যদি কাল আসো, নতুনেরে ভালবাসো
আঁধারেতে জ্বেলে নিও মোর বেদনা।'

[গানটি সুবীর সেনের গাওয়া ভার্সনের কথা অনুসরণ করা হয়েছে]

পরাগবরণ পাল ভারতের নিবন্ধকার

অনুবাদ গল্প

সূর্পণখা

অমিত চৌধুরী

সে কিছু সময় ধরে দু'জন পুরুষ লোককে দেখছিল। তাদের সঙ্গে একজন স্ত্রী, সিঁথিতে সিঁদুর। মহিলাটি মাঝে মাঝে ছোট্ট কুঁড়েঘরের ভেতরে যাচ্ছিল, আবার বের হয়ে আসছিল। সে একটা ঝোপের আড়াল থেকে তাদের দেখছিল। তাই তারা তাকে দেখতে পায়নি। তাদের সাধারণ ভ্রমণকারী বলে মনে হচ্ছে না। তারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দাও নয় বলে মনে হয়। তারা ওখানে হয়তো নবাগত। মাঝে-মধ্যে পুরুষ দুটো বনে গেলে মহিলাটি ঘরের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে– সূর্পণখা দূর থেকে আগ্রহ-সহকারে তাদের কাজকর্ম ও চলাফেরা দেখতে চেষ্টা করে– সে দেখতে পায় তারা বন থেকে যা যা নিয়ে আসে তা পরিষ্কার-পরিছন্ন করে মহিলাটি রান্নাবান্না করে।

কোঝা যায়, ছোট্ট কুটিরটিতে শুক-সারি পরিবেশ বিদ্যমান ছিল।

সূর্পণখার মনে হল সে ওই সুন্দরী মহিলাটির চেয়ে শক্তিশালী। তবু সে পুরুষদুটোকে বাড়ির কাজ করতে দেয় না। ঘরের সব কাজ সে নিজেই করে। পুরুষ দু'জনের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত লম্বা ও বয়সী তাকেই মহিলাটি বেশি পছন্দ করে। তার কর্তৃত্বই বেশি। মহিলাটি নত হয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করে এবং তার পরনের ধুতি থেকে ধুলো ঝেড়ে দেয়। পুরুষ দু'জনকে মানুষ বলে মনে হলেও তাদের মধ্যে দেবত্ব ভাব বর্তমান।

সেই পুরুষটি তার চাইতে সুন্দর চেহারার। পুরুষটির স্ত্রীর সৌন্দর্যের কাছে সে কিছু নয় ভেবে সূর্পণখার মনে ভয় ও ঈর্ষা জাগে; সে তার নিজের পেশীবহুল বাহু দু'টির দিকে তাকাল। সে তার হাত দিয়ে ভারী জিনিস এমনকি তাদেরকেও দূরে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে। যাহোক, পুরুষটির ঔজ্জ্বল্য যেন সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত। সূর্পণখা ধারে কাছের একটা পুকুরের জলে নিজের চেহারা দেখার চেষ্টা করল। সে দেখতে পেল তার নাসারন্ধ্র গুহার মত, আর তার ওষ্ঠদ্বয়ের নিচ লম্বা লম্বা দাঁত বেরিয়ে আছে। এগুলো বড়ই দৃষ্টিকটু! সে তার নিজের চেহারা দেখে কেঁদে উঠলে কেউই তাকে সহানুভূতি জানাতে এল না, এমনকি সে তার নিজের কাছ থেকেও সমবেদনা পেল না। পুকুরের জলে তার নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব দেখে সে বড়ই দুঃখ পেল। সে ভাবল তার তুলনায় পুরুষটির চেহারা কী সুন্দর!

প্রায় ছয়দিন অতিবাহিত হবার পর সূর্পণখা পুরুষটির কাছে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। এ কয়দিন সে ভয়ভীতির মাঝে ঝোপঝাড়ের পেছনে লুকিয়ে ছিল, তাই সে তখনও তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরেই ছিল। সে এতদিন ওখানে একটা জন্তুর মত বাস করছিল। জন্তু-জানোয়ারেরাও তার দিকে তাকাতে আরম্ভ করে। আশৈশব তাকে শেখানো হয়েছিল যে রাক্ষসরা মানুষ ও দেবতাদের চাইতে উত্তম– রাক্ষসরা সাহসী, দানশীল,স্বার্থহীন ও মহৎ স্বভাবের...।

তবে এটা সত্যি যে তাদের চাইতে মানুষ ও দেবতাদের চেহারা সুন্দর। তাদের কেউই জানে না কেন তাদেরকে অসুন্দর করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছিল, অনেক অনেকদিন আগের একট দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে, রাক্ষদের এক নারী একজন দেবতা কিংবা মানুষের প্রেমে পড়ে। কিন্তু তাদের মিলন কখনোই বাস্তবে সম্ভব হয় না। সে পূর্ণবয়স্কা নারী হওয়া সত্ত্বেও প্রেমে ব্যর্থ হবার ফলে তার মধ্যে এক ধরনের নির্লিপ্ত অনুভূতির সৃষ্টি হয়। সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। সে একাকিত্বকে মেনে নিতে দ্বিধা করে না। সেই রাক্ষসীর জীবনে সেটা ছিল চরম বেদনার ব্যাপার।

সূর্পণখা নিজের চেহারা পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিল। সে তার ইচ্ছেমত অন্য আরেকটি রূপ সাময়িকভাবে গ্রহণ করবে। সে একজন রূপবতী তরুণীতে পরিণত হবে। সে তার রূপ পরিবর্তনের জন্য এমন একটা জায়গা বেছে নিল যেখানে কেউ কোথাও নেই। গাছে শুধু কয়েকটি পোকামাকড় ও পাখির বসবাস। সেখান থেকে নিজের চেহারার রূপান্তর ঘটিয়ে সে পুকুরের জলে নিজের চেহারাটা দেখল। নিজের নতুন চেহারা দেখে তার হৃদয়-মন জুড়িয়ে গেল। সে যেন একজন বিয়ের কনে। পুকুরের জলে তার যে ছবি ভেসে উঠল তাতে সে নিজেকে আয়তনয়না, আজানুলম্বিত আলুলায়িত কেশ এক মোহিনী নারীকে দেখতে পেল। এটা তার নিজের চেহারার প্রতিবিম্ব কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারল না। তার মনে হল, পুকুরের জলে তবে কি অন্য কারো চেহারা প্রতিবিম্বিত হয়েছে!

দুই.

রাম ও তার ছোটভাই লক্ষ্মণ জ্বালানিকাঠ সংগ্রহ করতে বনে গিয়েছিলেন। দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে সূর্পণখার মুখ শুকিয়ে গেল। তার মধ্যে ভয়ের উদ্রেক হল। তারপর তার মনে পড়ল সে কীভাবে অকল্পনীয়ভাবে নিজেকে এক সুন্দরী তরুণী নারীতে রূপান্তরিত করেছে।

সে নিজেকে সংযত করে রামের দিকে তাকিয়ে ভাবল, 'তিনি মানুষ নন, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত তিনি একজন দেবতা।' তারা তার নিকটবর্তী হলে সূর্পণখা তাদের দেখে বিমোহিত হয়ে লজ্জাশরম ত্যাগ করে নিজেকে তাদের সামনে তুলে ধরল।

রাম না দেখার ভান করে নিচু স্বরে ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি?'

লক্ষ্মণ তাৎক্ষণিকভাবে পেছন দিকে একনজর তাকিয়ে একটু নিচু হয়ে কুঠারটা তুলে ফিসফিস করে বললেন, 'আমি জানি না– তবে এই সুন্দরী কুমারী মেয়েটির গা থেকে রাক্ষসীর গন্ধ পাচ্ছি। সে তার দেহটাকে কদাকার সাজে সাজিয়েছে। এই গহনাগুলো সে হয়তো অতি সম্প্রতি পরেছে।'

রাম ফিসফিস করে বললেন, 'এস আমরা তার সাথে একটু কৌতুক করি।' তারা বনে বনে ঘুরে বড়ই ক্লান্ত, আর তখন একজন সুন্দরী তরুণী তাদের আনন্দ দিতে ধীর পায়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

'প্রভু–', সুন্দরী তরুণীটি বলল, 'প্রভু– এভাবে নিজেকে আপনার সামনে উপস্থাপন করার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাকে একা একা চলাচল করতে দেখে ভাবলাম আপনি হয়তো পথ হারিয়েছেন।' রাম ও লক্ষ্মণ একে অপরের মুখের দিকে তাকালেন। দুঃখকষ্টে তাদের মুখ ভারাক্রান্ত হলেও এক মুহূর্তে তাদের চোখে-মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। তারা দু'জনেই লক্ষ্য করলেন মেয়েটি লক্ষ্মণকে আমল দিচ্ছে না। তার প্রতি এমন আকুতি জানানোর জন্য রাম অবাক হলেও মনে মনে আমোদিত হলেন। রাক্ষসী থেকে রূপ বদলিয়ে এ রূপ গ্রহণ করেছে ভেবে তার মনে বিতৃষ্ণা জাগল। সুন্দরী মহিলার এহেন সন্দিগ্ধ ও অপ্রীতিকর আবেদনে রাম মোটেই সন্তুষ্ট হলেন না। পৌরুষদীপ্ত তারুণ্য থাকা সত্ত্বেও তরুণীটির রূপলাবণ্য রামের মধ্যে কোনপ্রকার মতিভ্রম ঘটাতে পারল না। লক্ষ্মণ উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কুমারী, আপনি কে? আপনি কী এই এলাকা থেকে এসেছেন?'

'বেশি দূর থেকে নয়' সুন্দরী মহিলাটি জবাবে বলল। বেখেয়ালে তার অঙ্গ থেকে কাপড় খসে পড়লে তা ঠিক করে সে রামের কাছে গিয়ে তার বাহু স্পর্শ করে বলল, 'প্রভু, আসুন আমরা এখান থেকে একটু দূরে যাই। সেখানে গিয়ে আপনি বিশ্রাম নিতে পারবেন।' সুদর্শন পুরুষটির জন্য

বনের পথে কান্না ও চিৎকার শোনা গেল। নাক দিয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়া অবস্থায় সূর্পণখা বনের গাছপালার চারপাশে ঘুরতে লাগল। চোখের জলের সঙ্গে নাকের রক্ত একাকার হয়ে মুখে ছড়িয়ে পড়ে মুখটা কদাকার করে তুললেও সে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ঘন ঘন মুখ মুছতে লাগল। যাকে সে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার জন্য আকুতি জানিয়েছিল তিনি তাকে অপছন্দ করে শাস্তি দিলেন!

রাক্ষসীর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ভীতিও দেখা দিল।

'আমি তোমার কথায় রাজি নই', দেবতুল্য পুরুষটি নম্রকণ্ঠে বললেন। 'একজন নারী হয়ে তুমি একলা এখানে কী করছ? তোমার কি চোরচোট্টাদের ভয় নেই?'

'ভয় কাকে বলে আমি জানি না' সুন্দরী সরোষে বলে উঠল। 'তাছাড়া আপনাকে দেখে আমার কিসের ভয়। আপনাকে দেখে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে পড়েছে।'

'তোমার সাথে যাবার আগে আমি আমার ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। তাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, তোমার সঙ্গে সে কী করবে।' সূর্পণখা বলল, 'প্রভু আপনি যাতে খুশি হন তাই করুন।' রাম লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে বললেন, 'এই প্রাণিটি আমাকে বিরক্ত করছে। তুমি এর প্রতিবিধান কর।'

'কী করতে হবে? অস্ত্রে ধার দিতে দিতে লক্ষ্মণ জিগ্যেস করলেন। রাম তার হাতের অস্ত্রের প্রশংসা করে বললেন, 'আমি জানি না, তবে এমন কিছু করতে হবে যা মহিলাটি অনেকদিন মনে রাখে। সে এতটা সাহসী– তাকে উচিত শিক্ষা দাও।'

লক্ষ্মণ অস্ত্র হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালে রাম উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'তাকে প্রাণে মেরো না কিন্তু।' একটু পরেই একটা চিৎকার শোনা গেল। লক্ষ্মণ ফিরে এলেন। তার অস্ত্রের ডগায় রক্ত লেগে আছে। 'আমি তার নাক কেটে দিয়েছি' লক্ষ্মণ ধারাল অস্ত্রটা দেখিয়ে রামকে বললেন, 'এটা ওর নাসারন্ধ্রের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল।' সূর্পণখা তাৎক্ষণিকভাবে তার চেহারা পরিবর্তন করে আগের অবস্থায় ফিরে গেলে তার অপূর্ব সৌন্দর্য মুহূর্তের মধ্যে উবে গিয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণির চেহারা ফুটে উঠল। লক্ষ্মণ তার অস্ত্রের ধারটা মুছতে মুছতে বললেন, 'তার আসল রূপটা এখন দেখতে পাওয়া গেল। সে একটা রাক্ষসী।' রামের মুখে হাসি নেই। 'সে ব্যথা পেয়েছে। বাহু দুটো নাড়াতে নাড়াতে ব্যাথায় কাতরাতে কাতরাতে সে উন্মত্ত জন্তুর মত বনের ভেতরে চলে যাচ্ছে' রাম বললেন। বনের পথে কান্না ও চিৎকার শোনা গেল। নাক দিয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়া অবস্থায় সূর্পণখা বনের গাছপালার চারপাশে ঘুরতে লাগল। চোখের জলের সঙ্গে নাকের রক্ত একাকার হয়ে মুখে ছড়িয়ে পড়ে মুখটা কদাকার করে তুললেও সে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ঘন ঘন মুখ মুছতে লাগল। এমনকি ব্যথা একটু কমলেও তার আর্তনাদ সমান তালেই চলতে লাগল। যাকে সে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার জন্য আকুতি জানিয়েছিল তিনি তাকে অপছন্দ করে শাস্তি দিলেন! এ অবস্থায় সূর্পণখা রাবণের খোঁজে সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

অনুবাদ **মনোজিৎকুমার দাস**

লেখক পরিচিতি

অমিত চৌধুরী প্রখ্যাত ইন্ডিয়ান ইংলিশ লেখক। জন্ম ১৯৬২ সালে কলকাতায়। তিনি ইংরেজি ভাষায় উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর ছোটগল্পের বই *রিয়েল টাইম: স্টোরিস এন্ড এ রেমিনিসেন্স* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *সেন্ট সিরিল রোড এন্ড আদার পোয়েমস* তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর উপন্যাসগুলোর মধ্যে *এ স্ট্রেঞ্জ এন্ড সাবলাইম অ্যাড্রেস*, *আফটারনুন রাগ*, *এ নিউ ওয়ার্ল্ড*, *দ্য ইম্মর্টালস*-এর নাম বিশেষভাবে করতে হয়। লেখালেখির জন্য নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন অমিত। ২০০২ সালে *এ নিউ ওয়ার্ল্ড* উপন্যাসের জন্য তিনি সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার এবং ২০১২ সালে *অন টেগোর*– রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। এ ছাড়াও তিনি ১৯৯১ সালে *এ স্ট্রেঞ্জ এন্ড সাবলাইম অ্যাড্রেস*-এর জন্য বেট্টি ট্রাস্ক পুরস্কার এবং কমনওয়েলথ রাইটার'স প্রাইজ, ১৯৯৪ সালে *আফটারনুন রাগ*-এর জন্য এনকোর এ্যাওয়ার্ড, ১৯৯৯ সালে *ফ্রিডম সঙ্* গ্রন্থের জন্য লস এঞ্জেলস টাইমস বুক প্রাইজ এবং ২০১২ সালে সমকালীন সাহিত্যের জন্য ইনফোসিস পুরস্কার লাভ করেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেও তাঁর দখল আছে। তাঁর বেশ কয়েকটি এ্যালবাম প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয়েছে। তিনি ইউনির্ভাসিটি অফ ইস্ট অ্যাঙলিয়া-র সমকালীন সাহিত্যের অধ্যাপক। এছাড়া তিনি ওল্‌ফসন কলেজের ক্রিয়েটিভ আর্টস ফেলো, কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির লেভারহাম ফেলো, এবং কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ববেং বার্লিনের ফ্রেইয়ি ইউনিভার্সিতাঁ-র স্যামুয়েল ফিসার অতিথি অধ্যাপক। এখানে ইংরেজিতে তাঁর লেখা 'সূর্পণখা' গল্পের বঙ্গানুবাদ পত্রস্থ হল।

শোক সংবাদ

ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের সদস্য শ্রী ওমপ্রকাশ ৩ জানুয়ারি ২০১৭ মারাত্মক অসুস্থ হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর জন্মস্থান দিল্লি। শ্রী ওমপ্রকাশ ১৯৮৫ সালের ২৫ জুন ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকে নিযুক্তি লাভ করেন এবং ২০১৫-এর ২৫ নভেম্বর ঢাকার হাই কমিশনে যোগ দেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্র সন্তানকে রেখে গেছেন।

তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে ভারতীয় হাই কমিশনে আয়োজিত এক শোকসভায় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন।

BE 100% SURE

Dettol

BPMPA

Proud Partner of icddr,b

ডেটল সাবান সুরক্ষা দেয় ১০০ রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে নতুন ডেটল সাবান আপনার পরিবারকে ১০০টি পর্যন্ত রোগবাহী জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়। এজন্যই ডাক্তাররা সবসময় পরামর্শ দিয়ে আসছেন ডেটল ব্যবহার করার জন্য।

নতুন

সুরক্ষা দেয়

১০০

রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

This is supported by Microbiological assessments versus bacteria and fungi at an external GLP facility (Bioscience Laboratories, Bozeman, Montana, USA)

** Dettol Original Soap is a Grade-1 soap

DettolBD

ভ্রমণ

কাশ্মীর

পর্বতের ভাঁজের ওপারে উন্মুক্ত উপত্যকা

জাকারিয়া পলাশ

কলকাতার এক ভদ্রলোক কাশ্মীর পৌঁছে প্রশ্ন করেছিলেন, 'দাদা, হিমালয় কোথায়?' বলেছিলাম, 'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন হিমালয়ে। চারদিকে দেখছেন হিমালয়। হিমালয় তো আর একটা পর্বত নয়! এ হল পর্বতমালা।' পশ্চিমে আফগানিস্তান থেকে শুরু, পূর্বে গেছে মায়ানমার পর্যন্ত। হিমালয় দক্ষিণের হাওয়ার বিরুদ্ধে এক দুর্ভেদ্য ঢাল রচনা করেছে। ভারত মহাসাগর থেকে ওঠা মৌসুমী বায়ু উত্তরে যেতে যেতে হিমালয়ে বাধা পায়। হিমালয়ের এই দুর্ভেদ্য ঢাল অপূর্ব উপায়ে সুসজ্জিত। ধাপে ধাপে উঁচুতে ওঠা। প্রথমে ছোটরা দাঁড়িয়ে; যাদের বলে ছোট পাহাড়; তারপর মাঝারি; সবশেষে সুবিশাল-উচ্চকিত পর্বতসারি। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হেঁটে হেঁটে উত্তরে যান। প্রথমে দেখা মিলবে ছোটদের। ক্রমান্বয়ে বড়রা সামনে পড়বে, উন্মুক্ত করবে তাদের উদার বক্ষ। সমুদ্রের পানিকণায় আর্দ্র বায়ুরা মেঘ হয়ে এগিয়ে যায় সামনে। ছোট পাহাড়েরা থামিয়ে দেয় তাদের গতি। তাই সমতল ভারতে আর বাংলায় বৃষ্টি হয়। সমতল বাংলায় তুমুল বৃষ্টিতে স্নান করে হেসে ওঠে কদম্ব ফুল। বৃষ্টিস্নাত এই গোটা অঞ্চলের জলবায়ুকে বলে 'মৌসুমী জলবায়ু'। যেসব মেঘ ছোটপাহাড়ের মাথায় ঠেকে না তারা বাধা পায় মধ্যহিমালয়ে। আছড়ে পড়ে ছোট ছোট পাহাড়ের গায়ে। তাই, ভুটান, নেপাল, উত্তরাখণ্ডের দক্ষিণ দিকে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টি হয় জম্মুতেও একই কারণে। তাই হিমালয়ের পাদদেশের পাহাড়গুলোও পায় মৌসুমী জলবায়ুর ছোঁয়া।

কাশ্মীরের অবস্থান মধ্য হিমালয়ে। তাই মৌসুমী জলবায়ু আর বৃষ্টিভেজা কদমফুল নেই সেখানে। বৃষ্টি সেখানে হয় বটে, তবে সে অন্য কারণে। পশ্চিমের ভূ-মধ্যসাগর থেকে বয়ে আসা শীতল, পূবালী বাতাস সেখানে খানিকটা বৃষ্টি আনে। বেশিরভাগই মার্চ-এপ্রিল মাসে। তাই কাশ্মীরের জলবায়ুকে অনেকে বলে খানিকটা ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু। তবে, মূলত কাশ্মীরের নিজস্ব আবহাওয়া-জলবায়ু হল, হিমালয়ান জলবায়ু। যার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, সে আনপ্রেডিক্টেবল। এই বৃষ্টি, এই মেঘ; আবার মিষ্টি রোদের হাসি; পরক্ষণেই মনে হবে, এ যে চামড়া জ্বালানো নিষ্ঠুর তাপদাহ।

মধ্যহিমালয় পর্বতমালার মাঝখানে একটা সমতল উপত্যকার নাম কাশ্মীর। পাখির মত আকাশ থেকে তাকিয়ে দেখলে একে মনে হয়, অনেকটা উল্টো পাঁচের মত। চারপাশে পর্বতের সারি, মধ্যে সমতলভূমিতে মানুষের বসবাস। শুধু পশ্চিম দিকে পর্বতের বেষ্টনী উন্মুক্ত হয়ে চলে গেছে নদী আর সড়ক। যেন, উল্টো পাঁচের মত জায়গাটার নীচে একটা লেজ লেগে মানুষের পাকস্থলির আকার নিয়েছে। ওয়াল্টার আর লরেঞ্জ-এর বর্ণনায় কাশ্মীর হল, 'কালো পর্বতমালার মধ্যে একখণ্ড জমিন সাদা পায়ের ছাপের মত'। খেচর হয়ে যখন আমরা দেখি কাশ্মীর, তখন সে নীরব, শুভ্র। তুলোর বলের মত আকাশে উড়ে চলা মেঘ, আর পর্বতের চূড়ায় জমাটবাঁধা বরফ একে অন্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যেন আলাদা করাই দায়। আকাশ থেকে মাটিতে নামলে, যতদূর চোখ যাবে, দেখা মিলবে ফার, পপলার অথবা দেওদার গাছের সারি। মাঝে মাঝে দু'একটি চিনার গাছ। চারপাশে তুষারে ঢাকা ঝিকিমিকি পর্বত আর পাহাড়ি ঝর্নার পানি জমা উপত্যাকা– সব মিলে মনোমুগ্ধকর!

সমতল কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে দেখবেন চারদিকেই পর্বত। কিন্তু, সেগুলো ততটা কাছে নয়। কাশ্মীরের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার। বানিহাল থেকে বারামূলা। আর প্রস্থে হল ৪২ কিলোমিটার। দুপুরের রোদে সমতলে দাঁড়িয়ে তাকান দূরের পর্বতের দিকে। সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে পর্ব থেকে পর্বান্তর। প্রথমে সবুজ সারিবদ্ধ গাছের জঙ্গল। তার পেছনে দৃষ্টির আড়ালে হয়তো-বা বিশাল জলাশয়। তার পিছে, রোদের আলোয় কালচে হওয়া শ্যামল গাছের মাদুর জড়ানো ঊর্ধ্বমুখী পর্বতের ঢাল। আরও পেছনে খাড়া উঠে যাওয়া কালো-ল্যাংটা পর্বত। তার চূড়ায় তুষারের সাদা টুপি আলিঙ্গন করছে উড়ন্ত মেঘের সঙ্গে। ধাপে ধাপে আঁকা এই বিরাট ছবিটির ক্যানভাস হল মস্তবড় নীল আকাশ। যেখানে আকাশের সঙ্গে পর্বতের চূড়ার মিলন হয়েছে সেটাই হল পর্যটকদের পরম আরাধ্য গন্তব্য। তাইতো, যে-কেউ ছুটে যেতে চান চূড়ার পানে। কাশ্মীরের কোথায় যাবেন বেড়াতে? এমন প্রশ্নে আমি বলব, যে-কোনও দিকে সমতল থেকে পর্বতের চূড়াপানে ধাবিত হন। সর্বত্র দেখবেন একই রূপ। শ্রীনগর হল কেন্দ্র। কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই এগিয়ে যান। উত্তর-পূর্ব দিকে সোন্‌মার্গ হয়ে লাদাখ, তারপর কোলহাই পর্বতের চূড়া, দক্ষিণ-পূর্বে পেহেলগাম, আরও নিচে কোকরনাগ, ডাকসুম, সিনথেন টপ, ভেরি নাগ, আচ্ছাবাল হয়ে সর্ব দক্ষিণে বানিহালের জওহর টানেল। দক্ষিণ-পশ্চিমে অ্যাহারবাল, মানসরোবর লেক, পীর কি গলি, মুঘল রোড। ক্রমে পশ্চিম দিক হয়ে উত্তরে উঠলে মিলবে ইউসমার্গ, চারার-ই-শরীফ, দুধপত্রি। উত্তর-পশ্চিমে এসে গুলমার্গ, উলার আর গুরেজ হয়ে মানসবাল লেক। এবার থিতু হন শ্রীনগরে। কাশ্মীরিরা যাকে উচ্চারণ করে শিরিনগর। গ্রামীণ কাশ্মীরি ভাষায় বলে 'শহর'। পাঁচ হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্যের শহর শ্রীনগর। তাকে দেখে নিতে পারেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। শহরের বুক চিরে বয়ে গেছে বিখ্যাত 'ঝিলম' নদী। দক্ষিণ থেকে উত্তরে। রয়েছে অগণন প্রত্ননিদর্শন। মুঘলদের প্রকৃতি আর প্রকৌশলের মিশেলে গড়ে তোলা বাগান-বিলাস আর আসরগুলো।

উপরের এই বর্ণনায় কাশ্মীরকে কেমন মনে হল? গামলার মত– যার চারপাশে পর্বতের দেয়াল, আর মাঝখানে সমতল? ঠিক গামলার মত নয়, কিছুটা বাথটাবের মত, লম্বাটে। তবে পর্বতে ঘেরা কাশ্মীরের মাঝের জমিন তেমন মসৃণ নয়, উঁচু-নিচু। আসলে, পর্বতের ঢাল সবসময় মসৃণ হয় না। হয় এবড়োথেবড়ো। বড় পর্বতের পাশে থাকে, বাচ্চা পর্বত, তারপর আরও ছোট্ট টিলা। তারপর যখন সমতল শুরু হয় তারও বুকের উপর থাকে ঢেউ খেলানো। কাশ্মীরও তাই। কাশ্মীরের জমিনটাও নদী ও নারীর মত ঢেউ খেলানো। কোথাও আবার সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে উঁচু থেকে নেমে যাওয়া নীচে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রলয়ঙ্করী বন্যা হয়েছিল কাশ্মীরে। গত এক শতকে ভয়ঙ্করতম বন্যা। তখন দেখেছি চোখের সামনে শ্রীনগরের বাজার-ঘাট-মানুষের ঘর পানিতে তলিয়ে গেছে। রাস্তার ডান পাশে ডাল লেকের তীরে অবস্থিত ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অফ টেকনোলজি পানিতে ডুবে গেল। হাজার হাজার এনআইটিপড়ুয়া শিক্ষার্থী ডুবে যাওয়া হোস্টেল ছেড়ে রাস্তার এপারে এসে ভিড় করেছিল। অন্যপারে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে আমরা ছিলাম নিরাপদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন খুলে দেওয়া হল বন্যার্ত মানুষের আশ্রয়ের জন্য।

বলছিলাম পর্বতের সৌন্দর্যের কথা। কাশ্মীরের প্রকৃতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল অপূর্ব লীলাময়ী পর্বতের মায়া। আর তার বুক থেকে সিঞ্চিত হয়ে কলকল রবে বয়ে চলা স্বচ্ছ পানির ঝরনাধারা; কোথাও স্রোতস্বিনী আর কোথাও মৃদুমন্দ গতিতে সাপের মত এঁকেবেকে যাওয়া সেই ঝরনা। পার্বত্য এলাকার সুন্দরের আরেক রহস্যের নাম 'উপত্যকা'; দুই পাহাড়ের খাঁজ। তার সামনে দাঁড়ালেই কেবল বোঝা যায় কবি ও শিল্পীরা নারীকে কেন প্রকৃতির সঙ্গে মেলান সবসময়। সে এক অদ্ভুত স্নিগ্ধতা! সে যেন সুখজাগানিয়া অসীম আলিঙ্গনের আমন্ত্রণ। সে বয়ে আনে দুই পাহাড়ের মধ্যখানে হারিয়ে যাওয়ার উচ্ছ্বাস। যে-কোন দিকে একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠুন। আপনার চোখজোড়া সমান্তরাল হয়ে উপরে উঠতে থাকবে; পক্ষান্তরে পাহাড়ের দেয়াল নামবে নীচে। অকস্মাৎ আপনার দৃষ্টি পড়বে সামনের বিস্তীর্ণ উপত্যকায়। আপনার চোখে একটা প্যানারমিক ভিউ এসে হাজির হবে। আপনার যদি সুন্দর একটি হৃদয় থাকে তাহলে এই দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি বলে উঠবেন, ওয়াও!! এবার বিপরীত দিকের

ঢাল বেয়ে নামুন উপত্যকায়। ঘুরে দেখুন। হয়তো দেখবেন সেখানেও আছে জীবন। মানুষের বসবাস আছে সেখানে। একটি সবুজ উপত্যকার মধ্য দিয়ে সুতীব্র বয়ে চলা ঝরনার বারিধারা মানুষকে যে কতটা উদ্বেলিত করে তা অনুভব করা যাবে কাশ্মীরে। স্পষ্টতই বাঙালিদের কাছে সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জন যেমন চেনাজানা, কাশ্মীরিদের কাছে তেমনি হল পার্বত্য ঝরনাধারার রিমঝিম শব্দ, আঁকাবাঁকা ঢেউ। এই দু'য়ের মধ্যে মিল হল, উভয়েই জীবন্ত, সদাচঞ্চল। মনে হবে এই উপত্যকার ওপারে বুঝি আবার নেমে যাওয়ার পথ। এখানেই হল সুন্দরের শেষ। এগিয়ে যান। রীতিমত চমকে উঠবেন, ওপাশে গেলে আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে আরও সুন্দর, আরও মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *সুখের আড়ালে* উপন্যাসের একটি উদ্ধৃতি এখানে সুপ্রযোজ্য: 'একটা সূর্যডোবার যে রঙ তার সব সৌন্দর্য কি লেখায় আসে? লিখতে গিয়ে তাই বড্ড দুর্বল লাগে। দেখেছি, অনুভব করেছি, আনন্দিত হয়েছি। সেটা আর পাঁচজনকে বোঝাই কি করে? কেবল সুন্দর, মনোহর, অতীব চমকপ্রদ– এ আর কত লেখা যায়?' কাশ্মীরের সুন্দরের মাহাত্ম্য লিখে বোঝাতে না পারার অসহায়ত্বে হয়তো সব লেখকই ভুগেছেন। অনেকেই ওই সুন্দরের বর্ণনা করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছেন সেই সব মানুষের কথা যারা হাজার হাজার বছর ধরে ওই প্রকৃতিকে লালন পালন করেছেন, কিংবা এখনও করছেন। যারাই ওখানে গিয়েছেন, ওই প্রকৃতির প্রেমে পড়ে দখল করতে চেয়েছেন। ভুলে গিয়েছেন যে, ওটা অন্যের সম্পদ। তারাই কাশ্মীরের নাম দিয়েছেন 'ভূ-স্বর্গ'। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল কাশ্মীরের তৃণভূমিতে মৃত্যুবরণ করার। তিনি ফার্সি ভাষায় বলেছিলেন, 'আগার ফেরদৌস বে-রোহী যামীন আস্ত্, হামীন আস্ত্, হামীন আস্ত্, হামীন আস্ত্'– যদি পৃথিবীতে কোন বেহেশত থেকে থাকে তাহলে তা এখানে, এখানে, এখানে।

যারা ওই মাটির সন্তান এই সুন্দরের প্রতি তাদের অনুভূতি কী? তা জানার চেষ্টা করেছি নিরন্তর। একবার যাচ্ছিলাম পেহেলগাম। হিমালয়ের গা বেয়ে নেমে আসা বরফ-ঠাণ্ডা পানি পাথরের ছোঁয়া লেগে ঘূর্ণি তুলে এগোয়। সেখানে জেগে ওঠে সাদা ফেনা। স্বচ্ছ পানির বুকে ঢেউ খায় আকাশের নীল। মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয় মানুষের হৃদয়-মন। যতই সামনে যাই, শুনি আরও বাকি আছে দেখার। নীচে বহতা নদী, পাশে পর্বতের দেয়াল জুড়ে সবুজ গাছ, দূরে তুষারের মুকুট পরা শৃঙ্গ, আরও দূরে নীল আকাশ। অনিন্দ্য সুন্দরের এই সজ্জা দেখে আমি হতবাক, বিহ্বল! আমার কাশ্মীরি বন্ধু জানতে চাইল, কেমন লাগছে পেহেলগাম? ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, সুন্দর! মনোহর!! গর্বে ওর বুক ফুলে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কাশ্মীর হামারা হ্যায়'।

জাকারিয়া পলাশ
সাংবাদিক ও গবেষক, সার্ক স্কলার, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়

ঘটনাপঞ্জি ❖ ডিসেম্বর

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

- ০৩ ডিসেম্বর ১৮৮২ ❖ শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর জন্ম
- ০৩ ডিসেম্বর ১৮৮৯ ❖ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম
- ০৭ ডিসেম্বর ১৮৭৯ ❖ বিপ্লবী বাঘা যতীনের জন্ম
- ০৮ ডিসেম্বর ১৯০০ ❖ উদয়শংকরের জন্ম
- ০৮ ডিসেম্বর ১৯৩৫ ❖ অভিনেতা ধর্মেন্দ্র (ধরস সিং দেওল)-র জন্ম
- ০৯ ডিসেম্বর ১৮৮০ ❖ বেগম রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের জন্ম
- ০৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬ ❖ কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর জন্ম
- ১১ ডিসেম্বর ১৯২৪ ❖ সাহিত্যিক সমরেশ বসুর জন্ম
- ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৫ ❖ রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির জন্ম
- ১২ ডিসেম্বর ১৮৮৭ ❖ অংকবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের জন্ম
- ১২ ডিসেম্বর ১৯০৫ ❖ সাহিত্যিক মূলক্‌রাজ আনন্দের জন্ম
- ১২ ডিসেম্বর ১৯৫০ ❖ তামিল অভিনেতা রজনীকান্তের জন্ম
- ১৩ ডিসেম্বর ১৯০৩ ❖ সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তীর জন্ম
- ১৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ ❖ অভিনেতা রাজ কাপুরের জন্ম
- ২২ ডিসেম্বর ১৮৫৩ ❖ শ্রী সারদা দেবীর জন্ম
- ২৪ ডিসেম্বর ১৯২৪ ❖ প্লেব্যাক গায়ক মহম্মদ রফির জন্ম
- ২৫ ডিসেম্বর ১৮৬১ ❖ স্বাধীনতা সংগ্রামী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যর জন্ম
- ২৮ ডিসেম্বর ১৯২২ ❖ সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর জন্ম

সংগীতের ভাষা সর্বজনীন

আইয়ুব বাচ্চু

আমার ব্যান্ড এলআরবিসহ বেশ কয়েকবার আমি ভারতে গান করতে গিয়েছি। ভারতে আমাদের প্রচুর ভাললাগার জায়গা রয়েছে। একবার সাউথ এশিয়ান কিছু ব্যান্ড ফেস্টিভালে আমরা বাজিয়েছিলাম পুরনো কেল্লায়। কলকাতার বাজনার কথাও আমি ভুলতে পারি না। ভারতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে আমরা একবার বাজানোর সুযোগ পেয়েছি। ওঁদের মুখে শুনেছি, ইতোপূর্বে ওখানে কোন কনসার্ট বিশেষত রক কনসার্ট হয়নি। ও রকম একটা জায়গায় বাজানোর সৌভাগ্যের জন্য আমরা ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে পরম বিনয় ও আন্তরিকতার সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই। যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতেও আমরা বেশ কয়েকবার বাজিয়েছি। এছাড়াও ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি, হলদিয়া কলেজ, হাবড়া, পানিহাটি, দিঘা ব্রিজ ফেস্টিভালে আমরা বাজিয়েছি– জোকাতেও বাজিয়েছি। জোকাতে একবার ইভেন্ট ব্যান্ড ফেস্টিভালে আমার বিচারক হবার সুযোগ হয়েছিল। ওখানে অনেক প্রতিভবান শিল্পীকে কাজ করতে দেখে আমি রীতিমত বিস্মিত হয়েছি। তরুণ সব ছেলেপুলে কী চমৎকার বাজায়!

কলকাতার গানের পরিবেশটা অনেক চমৎকার। কলকাতার প্রতিটা মানুষ বন্ধুবৎসল আর আন্তরিক। ওরা চিনুক না চিনুক অন্তত পক্ষে হেসে জিজ্ঞেস করবে, কেমন আছি। এটা আমার খুব ভাল লাগে। ওদের সম্বোধন, সম্ভাষণ এবং আদর করে বুকে টেনে নেওয়াটা খুব আনন্দের ব্যাপার।

কলকাতায় আমার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং শো ছিল যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। সেটা ছিল ওদের সপ্তম শো। ওই শো-তে আমাদের তৃতীয় কিংবা চতুর্থ গানটার পরে হঠাৎ দেখলাম দর্শকসারির এক ভাই গায়ের জামা খুলে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে আর পাগলের মত নাচছে...। আমার খুব অবাক লাগছিল, গান এরা এত ভালবাসে! পাগলের মত ওরা গান উপভোগ করে। এটা আমার খুব একটা প্রিয় শো। আর যদি আমরা বাজিয়ে কোথায় খুব বেশি তৃপ্তি পেয়েছি জিগ্যেস করেন তো বলব, রাষ্ট্রপতি ভবনে। ওঁরা আমাদের খুব সম্মান দিয়েছেন। এখানে বাজাতে বা গাইতে পারাটা অর্থাৎ একজন রাষ্ট্রপতির সামনে গাইতে বা বাজাতে পারাটা, তাও আবার ভারতের মত দেশের রাষ্ট্রপতির সামনে– এটা যে-কোন শিল্পীর জন্য একটা বিরাট ব্যাপার। আমাদের রীতিমত হাত-পা কাঁপছিল। এরজন্য আমরা দু'দিন সাউন্ড চেক করেছি আর প্র্যাকটিস করেছি। কিভাবে ঢুকব, কিভাবে বের হব, রীতিমত রিহার্সাল দিয়েছি। গান শুনতে গিয়ে নয়েজের জন্য যেন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কোন অসুবিধা না হয় এজন্য বারবার নয়েজ ঠিক করেছি– গান-বাজনা সবকিছু লিমিটেড সাউন্ড বা টোন ডাউন থাকে, সে-ব্যাপারে সতর্ক থেকেছি। সবচেয়ে ভাল লেগেছে ওঁর আমাদের আদর করাটা। এত বিখ্যাত একজন মানুষ, একজন রাষ্ট্রপতি এসে যখন সবাইকে বলছিলেন, 'খুব ভাল হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে', আমাদের মন ভরে গিয়েছিল। এর চেয়ে বড় পাওনা আর কী হতে পারে? ওঁর আতিথেয়তার কোন তুলনা হয় না। আমরা দু'দিন দু'রাত ওখানে ছিলাম। এটা চমৎকার একটা অনুভূতি। একটু মনেও হচ্ছিল না যে আমরা অন্য কোথাও আছি। মনে হচ্ছিল যে আমরা বাড়িতেই আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি। ঘরের ছেলে বিদেশ থেকে ঘরে ফিরলে যে-রকম আদর পায় সেরকমই একটা আদরের মধ্যে উনি আমাদের রেখেছিলেন। ওঁর স্নেহের কোন তুলনা নেই।

কলকাতায় অনেকেই বাংলা ভাষা বোঝেন, সাউথ এশিয়ান ব্যান্ড হিসেবে যখন কলকাতার বাইরে গিয়েছি, তখনও ভাষা কোন অসুবিধা সৃষ্টি করেনি। আমার মনে হয় গানের ভাষা সার্বজনীন। দিল্লিতে ম্যাক্সিমাম নন বেঙ্গলি স্পিকিং মানুষ রয়েছেন, তাদের কাছেও আমার মনে হয়নি– ওঁরা কোনওভাবে এ জিনিসটাকে খুব প্রাধান্য দিচ্ছেন যে আপনি বাংলায় কী ইংরেজিতে গান গাইছেন। গানটা কত চমৎকার, সেটাই সবার ভাবনার বিষয়। দিল্লিতে আমাদের খুব ভাল লেগেছে। আমরা যদিও ওখানে অনেকগুলো কাভার বাজিয়েছি কিন্তু সবচেয়ে ভাল লেগেছিল সেই মিউজিক লাভারকে, সেই রক মিউজিক লাভারকে। আমাদের আপন করে নিতে মনে হয় তার দু'মিনিটের বেশি সময় লাগেনি। আমরা জাস্ট শুরু করেছি আর শেষ করেছি।

আমাদের আগেও দিল্লিতে বাংলাদেশের অনেকগুলো ব্যান্ড শো করেছে। ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টার আমাদের ব্যান্ডগুলোকে এই সুযোগ করে দিয়ে নিঃসন্দেহে একটা বড় কাজ করছেন। তাদের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। এটা সাংস্কৃতিক মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করার চমৎকার এক উদ্যোগ। ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারে ইতোমধ্যে আমরা তিনবার বাজিয়েছি এবং আমরা একটা ব্লুজ নাইটও করেছি। আমাদের জীবনে বাংলা ব্লুজ নাইট সচরাচর কখনো হয় না। আমরা ওখানে গুলশানে বাজিয়েছি এবং এর আগে ধানমন্ডিতেও বাজিয়েছি। আমরা দেখেছি, এখানে যাঁরা যুক্ত বা যাঁরা গান শুনতে আসেন, প্রত্যেকেই গানপাগল। এত গানপাগল মানুষের সামনে গান বাজাতেও ভাল লাগে।

ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল সেন্টারকে আমাদের একটাই বলবার আছে– প্রতিনিয়ত কনসার্ট করুন, আমরা আপনাদের পাশে আছি। যখনই ডাকবেন তখনই হাজির হয়ে যাব। আর এই চমৎকার দর্শক যেন আজীবন থাকে আপনাদের সঙ্গে। আমার এই কথা কলকাতা, দিল্লি তথা ভারতবর্ষের সকল দর্শকবন্ধুর উদ্দেশে। ক'দিন আগে আমরা দিল্লির সন্নিকটবর্তী গুরগাঁওয়ে এক সাইবার হাবে বাজিয়েছি। ওখানে আমরা রক ফাস্টার বাজিয়েছি। এত মানুষ হয়েছিল। পৃথিবীর বুকে এশিয়াতে গর্ব করার মত এত চমৎকার একটা জায়গা থাকতে পারে, গুরগাঁওয়ের সাইবার হাবে না বাজালে বুঝতে পারতাম না। ওখানে যারা বাজিয়েছে তারাও আমারই মত বলেছে। ওটার জন্য আমাদের দিল্লির বন্ধু ব্যান্ড *পরিক্রমা*কেও ধন্যবাদ জানাতে চাই। আয়োজক যাঁরা ছিলেন, তাদেরকেও ধন্যবাদ। যতবারই ভারতে গিয়েছি, আমাদের একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। সংগীত প্রেমী যারা, যারা গান শুনতে পছন্দ করে, সেখানে ভাষা, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম– এসব কোন বাধা হতে পারে না। সংগীত সর্বজনীন।

আইয়ুব বাচ্চু শিল্পী
এলআরবি ব্যান্ডের প্রধান গায়ক

০১. ২২ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকার জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত সংগীতসন্ধ্যায় ভারতীয় শিল্পী অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের সংগীত পরিবেশন

০২. ০৫ নভেম্বর ২০১৬ একই মিলনায়তনে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত রবীন্দ্রসংগীত সন্ধ্যায় সাজেদ ও সালমা আকবরের সংগীত পরিবেশন

০৩. ১৭ নভেম্বর ২০১৬ সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশান ক্লাবে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত 'সুরের বাঁধনে–এপার-ওপার' সংগীতসন্ধ্যায় ভারতের ইমন চক্রবর্তী ও বাংলাদেশের স্বপ্নীল সজীবের সংগীত পরিবেশন

০৪. ১৯ নভেম্বর ২০১৬ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন আয়োজিত অন্তরা গাঙ্গুলির বই *তানিয়া তানিয়া* নিয়ে লেখকের সঙ্গে নিরুপমা সুব্রামনিয়ানের আলোচনা

০৫. ২৬ নভেম্বর ২০১৬ ঢাকাস্থ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সন্ধ্যায় ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত মৌমিতা রায়ের কত্থক নৃত্যসন্ধ্যা

০৬. ৩০ নভেম্বর ২০১৬ সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশান ক্লাবে ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আয়োজিত ভারতের রুহানি ভগ্নীদ্বয়ের নেতৃত্বে আইসিসিআর দলের সুফি সংগীতসন্ধ্যা

ভারতীয় হাই কমিশনের সর্বশেষ তথ্য
জানতে আমাদের ওয়েবসাইট, ফেসবুক,
টুইটার ও ইউটিউব নিয়মিত ভিজিট করুন,
লাইক দিন ও টুইট ফলো করুন:

www.hcidhaka.gov.in
/IndiaInBangladesh
@ihcdhaka
/HCIDhaka